Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেহনাজ ইয়াসমিন

রোলঃ 23100120407

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেহনাজ ইয়াসমিন

রোলঃ 23100120407

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সীরাহ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শেহনাজ ইয়াসমিন, আইডিঃ 23100120407 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সীরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

শেহনাজ ইয়াসমিন

আইডিঃ 23100120407

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম।..5

নবুওয়াতী জীবন ও দাওয়াত 6

শোকের বছর 10

রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর হিজরত..13

মদীনায় প্রবেশ 21

মদীনার জীবন: দাওয়াত ও জিহাদ 24

আসন্ন যুদ্ধের পদধ্বনি 25

বদর যুদ্ধ 38

বিজয়ের সুর 48

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের মোট যুদ্ধ 64

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান 65

বিদায় হজ..66

ইন্তেকাল...74

উপসংহার 94

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দ। রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ। আরব-আজমের এই উল্লসিত প্রকৃতি আর বর্ণিল আকাশ বিধবা আমেনার ঘরকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমেনার বিধ্বস্ত বুকের ভেতরেও এক অপার্থিব আনন্দের কলকলধ্বনি সুখের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে।

আমেনার কাছে বসে আছেন ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ নামের এক রমণী। বিপুল বিস্ময় নিয়ে তিনি দেখেন, আকাশের তারাগুলো শ্রদ্ধায় এমনভাবে আমেনার ঘরের প্রতি ঝুঁকে আছে যে, মনে হচ্ছে, তারাগুলো যেন আকাশ ছেড়ে তার উপর এসে পতিত হবে!

শেষ রাতের দিকে সব রহস্যের জট খুলে গেলো। সুবহে সাদিকের সময় আমেনার কোল আলোকিত করে পৃথিবীতে আগমন করলেন আশ্চর্য সুন্দর এক মানবশিশু-তাঁর কচি মুখখানা চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল, তাঁর ছোট্ট দেহখানা সদ্য-ফোটা ফুলের চেয়েও পবিত্র। আমেনার বুক ভরে গেলো অপার্থিব তৃপ্তিতে আর চোখ ভেসে গেলো অজানা এক অলৌকিক আলোয়। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠলো সিরিয়ার রাজমহল।

প্রকৃতির এমন অপরূপ সাজ দেখে বনু কুরাইযা, বনু নাযীর, ফাদাক ও খায়বারের ইহুদি পণ্ডিতরা বিস্মিত হয়ে বলাবলি করতে লাগলো- 'আজ রাতে আহমাদের নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে! আহমাদ জন্মগ্রহণ করেছেন!' তারা তাওরাত থেকে জানতো, আরবের বুকে জন্ম নেবেন সে মানবসন্তান, যিনি হবেন সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সকল নবীর চেয়ে সম্মানিত ।

নবুওয়াতী জীবন ও দাওয়াত

আলোচনা করতে পারি। কাজকর্মের ধারা প্রক্রিয়া এবং সাফল্য। সাফল্যের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা আলোচনা ও অনুধাবনের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেওনা)-এর নুবুওয়াতী জীবন আমরা দুটি অংশে বিভক্ত করে রাসূলুয়ায়াবে যে, এর এক অংশ থেকে ছিল ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। অংশ দুটি হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১. মক্কায় অবস্থান কাল প্রায় ১৩ বছর।
২. মদীনায় অবস্থান কাল দশ বছর।
তারপর মক্কী ও মাদানী উভয় জীবনকাল বৈশিষ্ট্য ও কর্ম প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ছিল স্তর ক্রমিক এবং ভিন্নধর্মী। তাঁর পয়গম্বরী জীবনের উভয় অংশ পর্যালোচনা এবং পরীক্ষণ করলে অনুক্রমিক স্তরগুলো সমীক্ষা করে দেখা বহুলাংশে সহজতর হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মক্কায় অবস্থানকাল এবং কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি অনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

১. সর্ব সাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের স্তর (তিন বছর)।

২. মক্কাবাসীগণের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর (নবুওয়াতী ৪র্থ বছর থেকে মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত)।

৩. মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ ও বিস্তৃতির স্তর (১০ম নবুওয়াতী বর্ষের শেষ ভাগ হতে মাদানী জীবন শুরু হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত)।

মদীনার জীবন এবং মদীনায় অবস্থানকালের স্তর অনুযায়ী বিস্তৃত আলোচনা যথাক্রমে সন্নিবেশিত হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া।

আবু জাহলের বাড়ি কাবার একদম কাছে, রাসূলেরও কাছে, কিন্তু ইসলামের আলো থেকে আবু জাহল ছিলো বহু দূরে। জাহেলিয়াতকে আঁকড়ে অন্ধের মতো অন্ধকার কানাগলিতে ঘুরে মরছে সে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অদ্ভুত এক আক্রোশে তার ভেতরটা দিবানিশি পোড়ে! একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আলোকিত করার জন্য রবের দরবারে হাত তোলেন আর অন্যদিকে সে ঘোষণা দেয়- 'যে মুহাম্মাদকে বধ করতে সক্ষম হবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। আর আমি সেই উটের জামিন।'

তার ঘোষণা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার জন্য যিনি এগিয়ে এলেন, তিনি উমর ইবনে খাত্তাব। হায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুজনের নাম নিয়েছেন, অথচ তারা দুজনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! উমরকে দেখা গেলো আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করছেন- 'উটের প্রতিভূ হওয়ার ঘোষণা যথার্থ আছে তো?' আবু জাহল বললো-'অবশ্যই!' নিশ্চিত হয়ে উমর তলোয়ার হাতে ছুটলেন রাসূলের সন্ধানে।দুপুরের তীব্র রোদে ধুলো উড়িয়ে পথ চলতে থাকলেন উমর। কিছুদূর এগোতেই নুআইম বিন আবদুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। নুআইম জিজ্ঞেস করলেন-'হে উমর, এ ভর দুপুরে কোথায় চলেছো?' 'মুহাম্মাদকে হত্যা করতে চলেছি।'-জবাব দিলেন উমর। 'মুহাম্মাদকে হত্যা করলে বনু হাশিম ও বনু যুহরার রোষাগ্নি থেকে তুমি কীভাবে পরিত্রাণ পাবে?'-আবার জিজ্ঞেস করলেন নুআইম। রেগে গেলেন উমর। বললেন-'আমার ধারণা, পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমিও পথচ্যুত হয়েছো।' নুআইম তখন বলে উঠলেন-'আমাকে এ সব বলছো! তুমি হয়তো জানো না, তোমাদের ধর্ম বর্জন করে তোমার বোন ফাতেমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়দ উভয়ে বেদীন হয়ে গেছে।' উমর এ কথা শুনে নুআইমকে ছেড়ে দিয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বোনের বাড়ির দিকে রওনা হন।

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহ তখন ফাতেমার ঘরে ফাতেমা ও তাঁর স্বামীকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমরের আগমন টের পেয়ে তারা চুপ হয়ে গেলেন। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহ ভয়ে দ্রুত ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়লেন। উমর ঘরে প্রবেশ

করে বললেন-'মনে হয় তোমরা বেদীন হয়ে গেছো?' উমরের ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন-'হে উমর, তোমাদের ধর্ম সত্য না হয়ে যদি অন্য ধর্ম সত্য হয়, তাহলে বলো, কী করা প্রয়োজন?' কী করা প্রয়োজন, উমর সেটা মুখে না বলে হাতে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। ক্ষুধার্ত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাঈদের উপর। ফাতেমা স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে উমর বোনকেও মারতে শুরু করলেন। রক্তাক্ত হয়ে উঠলো ফাতেমার মুখ। তিনি ভাইকে উদ্দেশ্য করে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন-'হে খাত্তাবের পুত্র, তোমার যা ইচ্ছা করো, কিন্তু আমরা তো মুসলিম হয়ে গেছি! হে আল্লাহর শত্রু, তুমি আমাদের প্রহার করছো আর আমরা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করি। জেনে নাও, আমরা মুসলিম হয়ে গেছি, যদিও তোমার নাক কর্তিত হয়েছে!'

বোনের আর্তনাদ শুনে উমরের মন হঠাৎ করে নরম হয়ে এলো। তিনি বললেন-'তোমরা যা পাঠ করছিলে, আমাকে তা শোনাও।' খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহ এবার ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন। ফাতেমা ভাইকে বললেন-'তুমি অশুচি! পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যায় না। অযু করে এসো।' রাগী উমরের কী যে হয়েছে। বোনের কথামতো বাধ্য বালকের মতো অযু করে এসে কুরআনের বাণী হাতে নিয়ে পাঠ করতে শুরু করলেন। তাতে সূরা তহা লেখা।ছিলো। উমর যখন পাঠ করলেন- 'আমিই সত্যিকার মাবুদ। আমি ভিন্ন কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার উদ্দেশ্যে নামায পড়ো।' তখন আনমনে বলে উঠলেন-'এ এক মহিমান্বিত বাণী!' খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন-'হে উমর, আপনার জন্য সুসংবাদ! আমি আশাবাদী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ হয়তো আপনার জন্য কবুল হয়েছে।' উমর বললেন-'হে খাব্বাব, তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।'

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহ উমরকে নিয়ে সাফা পর্বতের পাদদেশে মুসলমানদের মিলিত হওয়ার গোপন ঘর দারুল আরকামে গেলেন। গিয়ে দেখলেন দারুল আরকামের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। দরজায় করাঘাত করে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করা হলে উমরের উপস্থিতির কারণে কেউই দরজা খুলতে রাজি হলেন না। সবাই ভয় পাচ্ছেন। তখন হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন-'দরজা খোলো, তাকে ভেতরে আসতে দাও। আল্লাহ চাইলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং রাসূলুল্লাহর অনুগত হবে। আর

যদি তা না হয়, তবে তার অপকার থেকে তোমরা নিরাপদ থাকবে। তাকে হত্যা করা কঠিন কিছু নয়!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দরজা খুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। দরজা খুলে দেওয়া হলো। দুজন সাহাবী এগিয়ে এসে দুই দিক থেকে উমরের দুই বাহু বেষ্টন করে উমরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর তাঁর পোশাকের প্রান্ত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললেন-'হে খাত্তাবের পুত্র, ইসলাম গ্রহণ করো।' অতঃপর দুআ করলেন-'হে আল্লাহ, তাঁকে সুপথ প্রদর্শন করুন।'

আবার উমরকে বললেন-'হে উমর, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি লজ্জাকর আযাব অবতীর্ণ না করা পর্যন্ত তুমি কি প্রত্যাবর্তন করবে না?' উমর মার্জিত কণ্ঠে বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের উপর ঈমান আনয়নের জন্যই আমি উপস্থিত হয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীরা আনন্দে তাকবীর বলে উঠলেন। দূর হতে শোনা গেলো তাকবীরের ধ্বনি। উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠলো দারুল আরকাম।

শোকের বছর

আবু তালিব এর মৃত্যু:

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবূ ত্বালিবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুওয়ত ১০ম বর্ষের রজব মাসে।'

বরণ করেন। এ ব্যাপারে অন্য একটি মত হচ্ছে, তিনি খাদীজাহ -এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু

সহীহ বুখারীতে মুসাইইব(৫) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ ত্বালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নাবী কারীম (স) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবূ জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

أَيْ عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)

'চাচাজান। আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।"

আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবূ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবূ ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।' নাবী কারীম (স) বললেন,

)لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْه(

'আমি যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।' এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

)مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيم(ِ

'নাবী ও মু'মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।' (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয় : [القصص : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [٥٦

'তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।' (আল-ক্বাসাস ২৮: ৫৬)

এখানে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ)-কে কী পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। মক্কার অনাচারী মুশরিকগণের আক্রমণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতই তিনি ছিলেন দূর্গ স্বরূপ। কিন্তু আল্লাহর নাবী) এবং ইসলামের জন্য এত করেও যেহেতু

তিনি বংশপম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বহুত্ববাদের প্রভাব কাটিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না, সেহেতু দোরগোড়ায় আগত কামিয়াবি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। যেমন সহীহুল বুখারী শরীফে 'আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার চাচার কি উপকারে আসবে? 'কারণ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ বললেন, ِهُوَ فِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَّارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار

'তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করেছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তা হলে তিনি জাহান্নামের অতলে ডুবে যেতেন।"

আবু সাঈদ খুদরী গ্রেড) বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাঁর চাচা আবু ত্বালিবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, 'সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু'পায়ের গিঁটে পৌঁছবে।'

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু:

আবূ ত্বালিবের মৃত্যুর দু'মাস পর (মতান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উম্মুল মু'মেনীন খাদিজাতুল কুবরা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবনের ৫০তম বছর।

রাসূলুল্লাহ -এর জীবনে খাদীজাহ ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নাবী (স)-কে সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে ইসলাম বীজের অংকুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাবী কারীম (স) বলেছেন, আবহা

)أَمَنَتْ فِي حِينَ كَفَرَ فِي النَّاسُ، وَصَدَقَتْنِي حِيْنَ كَذَبَنِي النَّاسُ، وَأَشْرَكَتْنِي فِي مَالِهَا حِينَ حَرَّمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ وَلَدَهَا وَحَرَّمَ وَلَدَ غَيْرِهَا(

যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি অটোল বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে সত্যায়ন করলেন, আর লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।

সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল জে নাবী কারীম (স)-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইনি খাদীজাহ আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর হিজরত

রাতের অন্ধকার যখন আরো ঘনীভূত হয়, দু-চারটি নিশাচর বিহঙ্গ ও ঘুমন্তের হঠাৎ গোঙানি ছাড়া সব নীরব হয়ে যায় এবং গোটা জনপদকে মনে হয় মৃত্যুপুরী, ঠিক তখন একটি ঘরের সামনে একত্র হয় শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত ও বলীয়ান কয়েকজন গুপ্তঘাতক। তাদের ঘেরাও করা ঘরটির ভেতর থেকে বেরিয়ে প্রতিদিন শেষ রাতে সালাত আদায় করতে কাবার কাছে যান ঘরের বাসিন্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই রক্তপিপাসু ঘাতকরা অপেক্ষা করতে থাকে, কখন তিনি বেরিয়ে আসবেন আর তারা ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর উপর।

সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় বসে থাকে তারা এবং তাদের ভাবতে ভালো লাগে যে, আজই মুহাম্মাদের শেষ ঘুম। আবু জাহল ঠাট্টা করে তাদের বলে- 'মুহাম্মাদের ধারণা, তোমরা যদি তার অনুসরণ করো, তবে তোমরা আরব ও আজমের বাদশাহ বনে যাবে! মৃত্যুর পর তোমাদের আবার জীবিত করা হবে এবং জর্ডানের সুন্দর সুন্দর বাগিচাগুলোর মতো বাগবাগিচা উপহার দেওয়া হবে! আর যদি তোমরা তার অনুসরণ না করো, তবে সে তোমাদের জন্য সর্বনাশ হয়ে দেখা দেবে। মৃত্যুর পর তোমাদের আবার জীবিত করা হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে।'১

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শেষ হতে-না-হতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর বলেন- 'হ্যাঁ, আমি এ কথা বলি; তুমিও জাহান্নামিদের একজন।'

এরপর তিনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে রক্তপিপাসু ঘাতকদের দিকে ছুড়ে মারেন আর তেলাওয়াত করেন আল্লাহর পবিত্র কালাম-'আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি; অতঃপর আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।'

(সূরা ইয়াসীন: ৯)

তখন আল্লাহ তাআলা অস্ত্রসজ্জিত মুশরিকদের সাময়িকভাবে অন্ধ করে দেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে দিয়ে কাতার ভেদ করে চলে যান, কিন্তু তারা বিন্দমাত্র টের পায় না। আল্লাহর রাসূল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে পৌঁছে যান।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ হিজরতের আদেশের পর হিজরত করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন-'একটু সবর করো, আবু বকর! আমাকেও হয়তো হিজরতের জানুমতি দেওয়া হবে।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেছিলেন-'আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনার মনের ইচ্ছাও কি তাই?' তিনি বলেছিলেন-'হ্যাঁ।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ এ কথা শুনে ভীষণ আনন্দিত হন। নবীজির সঙ্গী হওয়ার আশায় হিজরত করা থেকে বিরত থাকেন এবং হিজরতের বাহন হিসেবে দুটি উটনিকে দীর্ঘ চার মাস যাবৎ বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে প্রতিপালন করেন।২

এরপর প্রতীক্ষিত সময় তখন এসে উপস্থিত হয়, যখন কুরাইশরা দারুন নদওয়ায় বৃদ্ধরূপী শয়তানের সাথে আলোচনাসভায় বসে। তখন অনেকেই অনেক রকম পরামর্শ দিয়েছিলো। কেউ বলেছে, তাঁকে বন্দি করে রাখতে; কেউ বলেছে, তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিতে; কিন্তু বৃদ্ধরূপী শয়তান সবগুলো প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছে।

এরপর আবু জাহল ঘৃণ্য একটি প্রস্তাব দেয়; সে বলে-'আরবের প্রত্যেকটি কবিলা থেকে একজন করে উৎসাহী, উদ্যমী ও সাহসী যুবক বাছাই করো। এরপর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধারালো তলোয়ার দাও; তারা সকলে একযোগে মুহাম্মাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক আঘাতে তাকে শেষ করে দেবে! তাহলে আমরা তার হাত থেকে

চিরদিনের জন্য রেহাই পাবো। আর এমন হলে তার রক্তের জিম্মাদারি গোটা আরবের সকল কবিলার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। বনু আবদে মানাফের সহমর্মীরা একা সকলের মোকাবেলা করার সাহস পাবে না। শুধু রক্তপণ নিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকবে আর আমরাও শুধু রক্তপণ দিয়েই বেঁচে যাবো!' বৃদ্ধরূপী শয়তান অন্যান্য প্রস্তাব অপছন্দ করলেও এ প্রস্তাব শুনে বলেছিলো-'হ্যা, এটাই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব! এ প্রস্তাবের তুলনা হয় না!'৩

তাদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন আর বলেন, তাঁকে মহান আল্লাহ মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আরো বলেন-'আপনি আজ রাতটি আপনার প্রতিদিনের বিছানায় কাটাবেন না!'৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবরটি শুনে দ্বিপ্রহরের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে উপস্থিত হয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চান। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন-'আবু বকর, আপনার ঘরের সবাইকে অনুগ্রহ করে একট বেরিয়ে যেতে বলুন।' আবু বকর বলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা সবাই আমার পরিবারের সদস্য।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন-'আমাকে জরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' আবু বকর বলেন-'আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক! ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি কি আপনার সঙ্গে থাকবো?' রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-'হ্যাঁ।' এ কথা শুনে আবু বকর বাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দে কেঁদে ফেলেন ।৫

এরপর সারা দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে প্রস্তুতি নেন।

কাফেররা নবীজিকে রাসূল বলে বিশ্বাস করতো না, তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতো, কিন্তু তাদের সম্পদ বিশ্বাসী মানুষটার কাছেই আমানত রাখতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মানুষের অর্পিত আমানত বুঝিয়ে দেন, যাতে তিনি মুশরিকদের আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। অতঃপর রাত গভীর হলে তিনি তরুণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন-'আমার সবুজ

চাদর মুড়ি দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ো। ভয় পেয়ো না। তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না!'

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহ তাঁর বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন, আর তিনি রক্তপিপাসু জল্লাদদের বিনিদ্র চোখের সামনে দিয়ে সোজা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে চলে যান। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ তৈরি ছিলেন। তাঁর বড় কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সফরের জন্য সামানপত্র আর খাবার প্রস্তুত করলেন, কিন্তু খাবারের পুঁটলি বাঁধার জন্য দড়ি খুঁজে পেলেন না। আসমা তখন নিজের কটিবন্ধ ছিঁড়ে পুঁটলি বেঁধে দিলেন।৬

দুই বন্ধু ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং উত্তর দিকে ইয়াসরিবের পথে না গিয়ে ইয়ামানগামী দক্ষিণের পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। হাযওয়ারা নামক বাজারে পৌঁছে আল্লাহর রাসূল বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে তাকান।

এটি এমন এক পবিত্র ঘর, যা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আর এটি সেই শহর, যেখানে তিনি তাঁর জীবনের তেপ্পান্নটি বসন্ত পার করেছেন। শৈশব, কৈশোর ধূলিকণায়, পাহাড় এবং যৌবনের কত যে মুহূর্ত মিশে আছে এই শহরের মাটি ও। ও মরুভূমির বাঁকে বাঁকে। দিনের পর দিন মরু লতাগুল্ম ও গাছেরা ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। এই শহরের প্রাণহীন পাথর তাঁকে দেখলেই বলেছে-'আসসালামু আলাইকুম ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ!' এই শহরের প্রকৃতি তাঁকে দিয়েছে মায়ের মমতার ছায়া। এখানেই আবু তালিব তাঁকে বাবার স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলেছেন। এ শহরের কোলেই তো খাদীজাকে নিয়ে ছিলো তাঁর সোনালি সংসার। এই শহরে তিনি চাঁদসুন্দর শিশুদের পিতা হয়েছেন। অথচ আজ তাঁকে বাধ্য হয়ে প্রিয় শহরের সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে! আজ এ শহরে রক্তপিপাসু ঘাতকরা তাঁকে হত্যার জন্য মুখিয়ে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন-'আল্লাহর কসম, তুমি আল্লাহর জমিনের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি এখান থেকে বের করা না হতো, তবে এখান থেকে আমি কখনোই

চলে যেতাম না।এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার পথ চলতে শুরু করেন।

অন্ধকার রাত। পথ অমসৃণ। বিপদের আশঙ্কা হলেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো রাসূলের আগে, কখনো রাসূলের পেছনে পথ চলেন, যেন বিপদ এলে রাসূলকে স্পর্শ না করে তাঁকে স্পর্শ করে।

এভাবে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করার পর তারা সাওর পর্বতে উপস্থিত হন। গগনস্পর্শী সুউচ্চ পর্বত সাওর। পাহাড়ে চড়া সুবিধার নয়। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পাথরের পর পাথর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ের জুতা খুলে নেন। তাঁর পা জখম হয়ে পড়ে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কাঁধে তাঁর ভর নিয়ে নেন। অনেক কষ্টে ক্লান্ত অবস্থায় দুজনে পৌঁছেন পর্বতশিখরে অবস্থিত একটি গুহামুখে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠেন-'আমি আগে গুহায় প্রবেশ করবো, এরপর আপনি প্রবেশ করবেন। ভেতরে যদি ক্ষতিকর কিছু থাকে, তবে তা আমার উপর দিয়ে যাবে, আপনি সুরক্ষিত থাকবেন!' গুহায় ঢুকে পড়েন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। ভালোভাবে গুহা পরিষ্কার করেন। দেখতে পান, অনেকগুলো ছিদ্র। নিজের চাদর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি। তারপর ছেঁড়া টুকরোগুলো দিয়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেন। কিন্তু দুটো ছিদ্র বাকি রয়ে যায়। তিনি ছিদ্র দুটির মুখে নিজের পা রাখেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে বলেন-'এবার আপনি প্রবেশ করুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে ছিদ্র দুটিতে তখনো ছিলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পা, আর ছিদ্রতে ছিলো বিষাক্ত সাপ। সাপ সুযোগ পেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পায়ে দংশন করে। চরম যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠার কথা আবু বকরের। কিন্তু

তিনি না নড়ে স্থির বসে থাকেন। নড়াচড়া করলে যদি প্রিয় নবীর ঘুম ভেঙে যায়! শরীরের ব্যথা তো আর মনের ইচ্ছা বোঝে না। যন্ত্রণার চরম আঘাতে ইচ্ছার বাঁধ ভেঙে তাঁর চোখ থেকে দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নবীজির মোবারক চেহারায় আর সাথে সাথে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি জেগে উঠে বলেন-'কী হলো আবু বকর?' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন-'হে আল্লাহর রাসুল, একটি সাপ আমাকে দংশন করেছে!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মুখ থেকে সামান্য লালা নিয়ে পরম মমতায় প্রিয় বন্ধুর পায়ে লাগিয়ে দেন। আর তাতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের সামনে উপস্থিত পাহারাদারদের অবস্থা তখন পাগলা কুকুরের মতো। তারা রাসূলের অপেক্ষায় বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একসময় এক ব্যক্তি এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ওত পেতে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে-'তোমরা এখানে কী করছো?' তারা উত্তর দেয়-'আমরা মুহাম্মাদের অপেক্ষা করছি। তিনি বেরিয়ে এলেই আমরা তাকে হত্যা করবো!' লোকটি বলে- 'তোমাদের আশা ব্যর্থ হয়েছে। মুহাম্মাদ তোমাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করে অনেক আগেই চলে গেছেন!' তারা বলে- 'আল্লাহর কসম, আমরা তো তাকে দেখতে পাইনি!' তারা হতভম্ব হয়ে যার যার মাথা থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করে। এরপর তারা ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা আকৃতি দেখে বলে-'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ তো এখনো চাদর জড়িয়ে তার বিছানায় শুয়ে আছে!'

এরপর তারা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে ওঠে এবং তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় আবিষ্কার করে। আলীকে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন- 'আমি কিছুই জানি না!'। তারা তাঁকে ধরে এনে কিছুক্ষণ কাবাপ্রাঙ্গণে বেঁধে রেখে একসময় ছেড়ে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে হারিয়ে তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং রেগে যায়। শুরু হয় পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি! তারা ছুটে যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে। দরজার সামনে গিয়ে হাঁক ছাড়লে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তারা জিজ্ঞেস করে—'তোমার পিতা কোথায়?' তিনি বলেন-'আমার পিতা কোথায়, তার আমি কী জানি!' প্রত্যুত্তরে পাষণ্ড আবু জাহল তাঁর কোমল গালে এত জোরে চড় মারে যে, তাঁর

কানের অলংকার ছিঁড়ে দূরে গিয়ে পড়ে। ৯ হইচই করে খোঁজাখুজি করে চলে তারা এবং জরুরি এক সভাও ডাকে। মক্কা থেকে বের হওয়ার সকল পথে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে দেয়। পাশাপাশি ঘোষণা দেয় যে কেউ জীবিত কিংবা মৃত মুহাম্মাদ অথবা আবু বকরকে এনে দিতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে।১০

মুশরিকরা এমনিতেই রাসূলের খুনপিয়াসি, তার উপর একশত উটের লোভে অসংখ্য লোক ঘোড়া ছুটিয়ে, উট হাঁকিয়ে, পায়ে হেঁটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খোঁজে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাহাড়-পর্বত, মরু-উপত্যকা আর গিরি-কন্দর চষে বেড়াতে শুরু করে লোভীর দল। তাদের একটি দল চলতে চলতে সাওর পর্বতে এসে উপস্থিত হয় এবং খুঁজতে খুঁজতে একদম রাসূলের গুহার সামনে উপস্থিত হয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ মাথা সামান্য উঠিয়ে যখন দেখলেন, তারা গুহামুখে দাঁড়ানো, তাদের পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তখন তিনি দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে বললেন-'হে আল্লাহর নবী, যদি তাদের কেউ মাথা নিচু করে উঁকি দেয়, তবেই তো আমাদের দেখে ফেলবে!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'আবু বকর, কথা বোলো না। আমরা শুধু দুজন নই, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন!'

আল্লাহ তাআলা রাসূলকে হেফাজত করার জন্য প্রেরণ করেন তাঁর অদৃশ্য সাহায্যকারী বাহিনী। প্রিয় বান্দার অন্তরে 'সাকীনা' নাযিল করেন তিনি। মুশরিকদের চোখে পর্দা ফেলে দেন আল্লাহ। তারা এত বোকা বনে যায় যে, গুহাটাকে বহু বছরের অব্যবহৃত পুরনো গুহা ভেবে ফিরে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওর পর্বতের গুহায় তিন রাত অবস্থান করেন। প্রতি রাতের শুরুভাগে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরুণ পুত্র আবদুল্লাহ তাঁদের কাছে এসে মক্কা ও কুরাইশদের সংবাদ বলেন এবং রাতের অন্ধকার থাকতেই মক্কায় ফিরে যান। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আজাদকৃত দাস আমের বিন ফুহাইরা বকরির পাল নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদের কাছে এলে তাঁরা বকরির দুধ পান করেন। তারপর আমের বিন ফুহাইরা মেষপাল নিয়ে আবদুল্লাহর পরে ফিরে যান, যাতে আবদুল্লাহর পদচিহ্ন বকরির পদাঘাতে মিলিয়ে যায়।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাও লুকিয়ে খাবার নিয়ে আসেন গুহায়। এভাবে তিন দিন পার হয়ে যাওয়ার পর খোঁজাখুঁজি কিছুটা কমে এলে তারা ইয়াসরিবের পথে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

উটনি দুটো ছিলো আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত লাইসী নামক এক মুশরিকের কাছে। সে রাস্তাঘাট আর অলিগলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলো এবং মুশরিক হলেও লোকটি ছিলো বিশ্বস্ত। তাকে বলে দেওয়া হয়েছিলো, তিন রাত পর উটনি দুটো নিয়ে হাজির হতে। সে কথামতো তিন রাত পর গোপনে উটনি দুটো নিয়ে হাজির হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্ধুকে নিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়েন। আমের বিন ফুহাইরাও খেদমতের জন্য তাঁদের যাত্রার সঙ্গী হন।

আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত তাঁদেরকে নিয়ে প্রথমে ইয়ামানগামী দক্ষিণের রাস্তা ধরে, এরপর উপকূলবর্তী পশ্চিমের পথ অবলম্বন করে। অতঃপর যখন এমন স্থানে পৌঁছে, যেখানে মানুষের আনাগোনা নেই, তখন সাগরের তীর ঘেঁষে উত্তর দিকে চলতে শুরু করে। এরপর এমন পথ ধরে, যে পথে মানুষের পদচারণা ছিলো অতি সামান্য ।

মদীনায় প্রবেশ

জুমআর সালাত শেষে নাবী মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐ দিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিবের পরিবর্তে মদীনাতুররাসূল বা রাসূলের শহর হয়ে যায় সংক্ষেপে একে মদীনা বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলিতে গলিতে সর্বত্র সেদিন তাকদীস ও তাহমীদের (পবিত্রতা ও প্রশংসার) গুঞ্জণ ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল। আনসারদের ছেলেমেয়েরা আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে নিম্নের কবিতার চরণগুলো সুর ও ঝংকার সহকারে গেয়ে বেড়াচ্ছিল।

من ثنيات الوداع ** طلع البدر علينا

ما دعا لله داع وجب الشكر علين

جئت بالأمر المطاع ** أيها المبعوث فينا

'দক্ষিণ পাশের পাহাড় হতে পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে।'

'কি উত্তম ধর্ম ও শিক্ষা! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রতি ওয়াজেব।'

তোমার নির্দেশ অনুসরণ করা ফরয। তোমার প্রেরণকারী হচ্ছেন কিবরিয়া (মহাপ্রভু)। আনসারগণ যদিও ধনী ছিলেন না, তবুও সকলের আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ তার বাসাতেই অবস্থান উটনীর লাগাম ধরে নিতেন এবং অনুরোধ করতেন যে, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রস্তুত করুন। ফলে তার উটনী আনসারদের যে বাড়ি কিংবা মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত সেখানকার লোকজন রয়েছে, আগমন করুন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ বলতেন 'উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেরে নির্দেশিত রয়েছে। ফলে উটনী একটানা চলতে থাকল এবং ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল যেখানে মসজিদে নাবাবী

রয়েছে। কিন্তু তিনি নীচে অবতরণ করলেন না। তারপর উটনী পুনরায় উঠে দাঁড়াল এবং কিছু দূরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখার পর পূর্বের জাগাতেই এসে বসে পড়ল। এরপর

রাসূলুল্লাহ) নীচে অবতরণ করলেন। এটা ছিল তাঁর নানীর, অর্থাৎ বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লা। আর উটনীর জন্য ছিল এটা আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ চেয়েছিলেন তাঁর নানার গোত্রে অবস্থান করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ)-কে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করে দিলেন। কিন্তু আবূ আইউব আনসারী উষ্ট্রের পালান উঠিয়ে নিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (স) বলতে লাগলেন মানুষ তার পালানের সঙ্গে রয়েছে। এদিকে আস'আদ বিন যুরারাহ (দ্র) এসে উটনীর লাগাম ধরে নিলেন, ফলে উটনী তার নিকটেই রয়ে গেল।'

সহীহুল বুখারী শরীফে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ) বলেন, 'কোন্ লোকের বাড়ি আমার থেকে নিকটে"?

আইউব আনসারী বলেন, 'আমার বাড়ি, হে আল্লাহর রাসূল) এটা আমার বাড়ি আর এটা আমার দরজা।'

তখন রাসূলুল্লাহ) তাঁকে বললেন, 'যাও এবং আমার বিশ্রামের জায়গা ঠিক কর। বললেন, কওমের উপর আল্লাহর বরকত হোক।

এবং নাবী তনয়া ফাতৃিমাহ ও উম্মে কুলসূম মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। এদের সকলকে আব্দুল্লাহ কিছুদিন পর নাবী পত্নী উম্মুল মু'মিনীন সাওদাহ এবং উসামা বিন যায়দ ও উম্মু আয়মান বিন আবু বাক্র - আবু বকরের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যাদের মধ্যে 'আয়িশাহও ছিলেন- নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য নাবী তনয়া যায়নাব এ, আবুল 'আসের নিকট থেকে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে আসতে দেননি। তিনি বদরের যুদ্ধের পরে এসেছিলেন।

'আয়িশাহ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা মদীনায় আসলাম আর তা সংক্রামক উপদ্রুত এলাকা। সেখানে নিম্নভূমি দিয়ে লবনাক্ত পানি প্রবাহিত হতো। তিনি আরো বলেন,

রাসূলুল্লাহ-এর মদীনায় পৌঁছার পর আবু বার ও বিলাল জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আব্বাজান! আপনি কেমন আছেন? তারপরে বিলালকে লক্ষ্য করে বললাম আপনি কেমন আছেন? তিনি অর্থাৎ 'আয়িশাহ মা বলেছেন যখন আবু বাক্স -এর জ্বর আসত তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করতেন,

كل امرئ مُصَبح في أهله ** والموت أدنى من شراك نَعْلِه

অর্থ: প্রতিটি মানুষকে তার আত্মীয়ের মাঝে সুপ্রভাত বলা হয়ে থাকে অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।

বিলালের অবস্থা যখন একটু সুস্থ থাকত তখন তিনি নিজের দুঃখপূর্ণ স্বর উঁচু করে বলতেন:

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ** بوَادٍ وحولى إذْخِرٌ وجَليل وهل أردن يوما مياه مجنَّة ** وهل يَبْدُون لى شامة وطفيل

'হায় যদি আমি জানতাম যে, আমার কোন একরাত্রি যাপন হবে এক প্রান্তরে (মক্কায়) এবং আমার পাশে ইযখার ও জালীল (ঘাস) থাকবে এবং কোন দিন কি মাজিন্না ঝর্ণাতে অবতরণ করতে পারব এবং আমি সামা ও তুফাইল পাহাড় দেখতে পাব?'

'আয়িশাহ বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ()-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের এ প্রলাপের সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন, اللَّهُمَّ حَبِبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُّ، وَصَحِحْهَا، وَبَارِكْ فِي صَاعَهَا وَمُدِهَا، وَانْقُلْ حَمَاهَا فَاجْعَلْهَا بالجحفة.

"হে আল্লাহ, আমাদের নিকট মদীনাকে এমন প্রিয় করে দাও যেমন মক্কা প্রিয় ছিল বরং তার চেয়ে অনেক বেশী। মদীনার মাঠ, ঘাট ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী করে দাও এবং উহার 'সা" ও 'মুদ্দে' (শস্য মাপার পাত্র বিশেষ) বরকত দাও, তার অসুখ প্রত্যাবর্তন করে জুহফাহ'তে পৌঁছিয়ে দাও।"' আল্লাহ তাঁর দু'আ শুনলেন ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

এখান পর্যন্ত নবুওয়াতের পর পবিত্র জীবনের এক প্রকার ও ইসলামী দাওয়াতের এক যুগ অর্থাৎ মক্কী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমরা এখন তাঁর মাদানী জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দাতা।

মদীনার জীবন: দাওয়াত ও জিহাদ

মদীনার জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. প্রথম পর্যায়: ইসলামী সমাজ নির্মাণের ও ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠালাভের যুগ। এ পর্যায়ে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরের মধ্য হতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বের থেকে শত্রুরা আক্রমণ চালিয়েছে যাতে মদীনায় ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে ৬ হিজরী সনে যুল ক্বা'দাহ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে মূর্তি পূজারী নেতাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, এটার সমাপ্তি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বারা ঘটে। এ পর্যায়কে বিশ্বের রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণের পর্যায়ও বলা যেতে পারে।

৩. তৃতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ের বিস্তৃতি ঘটেছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল রাসূলুল্লাহ)-এর পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এ সময়ে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এ পর্যায় বিভিন্ন জাতি ও গোত্রসমূহের মুখপাত্রগণের মদীনায় আগমনের পর্যায়।

আসন্ন যুদ্ধের পদধ্বনি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়া গুরুতর অসুস্থ। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিযানে বেরুতে হচ্ছে। তিনি তো শুধু একজন পিতা নন, তিনি তাঁর উম্মতের জিম্মাদারও।

কন্যাদের জন্য তিনি কষ্ট পান। তাঁর বড় কন্যা যায়নাব মক্কায়। মেয়েটির মা নেই, বাবার স্নেহ থেকেও দূরে। যায়নাবের স্বামী আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই যায়নাব স্বামীর সাথে মক্কাতেই রয়ে গেছেন। যায়নাব আবুল আসকে ভীষণ ভালোবাসেন আর আবুল আসও যায়নাবকে অসম্ভব ভালোবাসেন। আবুল আস পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হননি, কিন্তু স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে ভালোবাসতে কার্পণ্যও করেননি। মক্কার কাফেররা দল বেঁধে আবুল আসকে বলেছিলো-'আবুল আস, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দাও; এর পরিবর্তে তুমি যে কোনো কুরাইশ-সুন্দরীকে চাও, আমরা তার সাথে তোমার বিয়ে দেবো।' আবুল আস বলেছিলেন-'আল্লাহর কসম, তা হয় না। আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তার পরিবর্তে সকল নারী আমাকে দিলেও আমার তা পছন্দ নয়।'১

স্বামী-স্ত্রীর এমন ভালোবাসা খুব কম দেখা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়ার সংসারটাও এমন ভালোবাসায় ভরপুর। তাছাড়া রুকাইয়া ও তাঁর স্বামী দেখতে যেমন অত্যন্ত সুন্দর, গুণেও তেমনি অনন্য।

লোকজন বলাবলি করে- 'মানুষের দেখা দম্পতির মধ্যে রুকাইয়া ও তাঁর স্বামী উসমান হলো সর্বোত্তম।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন রুকাইয়ার ঘরে গিয়ে দেখেন, তিনি উসমানের মাথা ধুয়ে দিচ্ছেন। আরেকদিন দেখেন, রুকাইয়া উসমানের মাথায় চিরুনি করছেন।২

এই গুণবতী মেয়েটি অসুস্থ, এমন সময় দুই সাহাবী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার খবর নিয়ে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম সিরিয়া-ফেরত এই কাফেলার অবস্থান ও গতিবিধি জানার জন্য তাঁদেরকে উত্তরে প্রেরণ করেছিলেন।

কুরাইশদের বিশাল কাফেলা মক্কার বড় বড় নেতা আর বিত্তশালীদের মূল্যবান ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরপুর। বিভিন্ন ধরনের জাগতিক প্রাচুর্য বয়ে চলেছে প্রায় এক হাজার উট, অথচ কাফেলার প্রহরা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে মাত্র চল্লিশজন লোক!

জালেম মক্কাবাসীর অর্থনীতি ধসিয়ে দেওয়ার জন্য এমন সুবর্ণ সুযোগ কমই আসবে হয়তো। মদীনায় আক্রমণ করার যে হুমকি তারা দিয়েছিলো, সে হুমকির জবাব দেওয়ার মোক্ষম সময় এটা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন- 'কুরাইশদের প্রাচুর্যে ভরা একটি বাণিজ্য-কাফেলা তোমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা বেরিয়ে পড়ো। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা সমুদয় সম্পদ গনিমতের মাল হিসেবে প্রদান করবেন।'

তিনি কারো উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করলেন না। বিষয়টি ব্যক্তিগত আগ্রহের উপর ছেড়ে দিলেন। প্রায় তিনশো সতেরোজন সাহাবী তৈরি হয়ে গেলেন; ছিয়াশিজন মুহাজির আর বাকিরা আনসার। আনসারদের মধ্যে একষট্টিজন আউসের আর সত্তরজন খাযরাজ গোত্রের। সবাইকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে পড়লেন। প্রিয় সাথী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথেই আছেন, আছেন উমর এবং আলীও। উসমানও আসতেন, কিন্তু রুকাইয়া যে অসুস্থ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকাইয়ার কাছে তাঁকে রেখে এসেছেন।

অধিকাংশ সাহাবী আসেননি। কারণ কেউ ধারণাও করেননি, বাণিজ্যিক এই কাফেলার পরিবর্তে তাদেরকে দাঁড়াতে হবে যুদ্ধের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত এক হাজার যোদ্ধার বিশাল এক বাহিনীর সামনে। তাঁরা ধারণা করেছেন, এটি নিয়মিত অভিযানের মতোই একটি অভিযান। এজন্য অভিযানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরাও যুদ্ধের জন্য তেমন কোনো প্রস্তুতি নেননি।

সমগ্র সেনাদলে মাত্র দুটি ঘোড়া। একটি যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর, অন্যটি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী রাদিয়াল্লাহু আনহুর। উট মাত্র সত্তরটি। প্রতিটি উটে দুই বা তিনজন পর্যায়ক্রমে আরোহণ করে পথ চলছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আলী ও মারসাদ ইবনে আবু মারসাদের সাথে একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করে পথ চলছেন।

মদীনার নামাযে ইমামতির দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহকে দেওয়া হয়েছে। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর রাসূল আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহকে মদীনার ব্যবস্থাপক হিসেবে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

সাদা রঙের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে চলে মুসলিম বাহিনী। মুহাজিরদের পতাকা আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে পতপত করে উড়ছে।

আনসারদের পতাকা সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। উভয় দলের সম্মিলিত পতাকা মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে।

ডান দিকের দলটির অধিনায়ক ছিলেন যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহ আর বাম দিকের দলটির অধিনায়ক মিকদাদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহ। সমগ্র বাহিনীতে এ দুজন ছিলেন রণকৌশলে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। মধ্যখানের পেছনের বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় কায়স ইবনে আবু সাআ রাদিয়াল্লাহু আনহকে। প্রধান সিপাহসালারের দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে গ্রহণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওহা থেকে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার রাস্তা বাম দিকে রেখে ডান দিকের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে তিনি প্রথমে নাযিয়াহ এবং পরে রুহকান উপত্যকা অতিক্রম করেন। চলতে চলতে সাফরার মেঠোপথ ধরে এক সময় ওয়াদিয়ে সাফরায় উপস্থিত হন। সাফরায় উপস্থিত হওয়ার পর স্থানীয় গোত্রের দুজন লোককে কুরাইশ-কাফেলার খবর সংগ্রহের জন্য বদর প্রান্তরের দিকে প্রেরণ করেন। ৩

কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ান অত্যন্ত ধূর্ত ব্যক্তি। সে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলো। সে জানতো, মক্কা-মদীনার যে পরিস্থিতি, তাতে পথ অতি ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে প্রতিটি কাফেলার কাছে পথের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো সে। সুতরাং নবীজির কাফেলার খবর সে জেনে গেলো এবং খবর পাওয়ার সাথে সাথে যমযম ইবনে আমর গিফারীকে মোটা অর্থের বিনিময়ে মক্কায় প্রেরণ করলো।

যমযম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মক্কায় পৌঁছে আরবদের রীতি অনুযায়ী উটের হাওদা উল্টিয়ে পিঠে দাঁড়িয়ে নিজের পোশাক ছিঁড়ে 'সাহায্য সাহায্য' বলে চিৎকার করতে শুরু করলো। সে চিৎকার করে বললো- 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, কাফেলা! কাফেলা! আবু সুফিয়ানের কাছে তোমরা তোমাদের যে সম্পদ অর্পণ করেছো, তা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের হাতে চলে যাচ্ছে। আমি জানি না, তোমরা তাদের পাবে কি না!'

মক্কার বিশিষ্ট লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে এলো। তারা রেগে আগুন হয়ে বললো- 'মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীরা আমাদেরকে ইবনে হাযরামীর কাফেলার মতো দুর্বল মনে করেছে নাকি? তা কখনো নয়। আল্লাহর কসম, সে অতি শীঘ্রই জানতে পারবে, প্রকৃত ব্যাপার কী!'

শুরু হলো প্রস্তুতি। কেউ নিজে প্রস্তুত হলো, কেউ বা নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রস্তুত করালো। কাউকে আবু জাহল জোর করে অংশগ্রহণ করালো। উমাইয়া বিন খালাফ পণ করেছিলো, সে মক্কা থেকে কোনো দিন বের হবে না।

বেশিদিন আগের নয় সে ঘটনা। সাদ বিন মুআযের সাথে ছিলো উমাইয়ার পুরনো বন্ধুত্ব। মদীনায় গেলে উমাইয়া সাদের বাড়িতে অবস্থান করে আর মক্কায় এলে সাদ উমাইয়ার বাড়িতে অবস্থান করেন। সাদ কিছুদিন আগে মক্কায় উমরা করতে আসলে তাওয়াফের সময় আবু জাহলের সাথে রাগারাগি হলে উমাইয়া সাদকে বললেন-'আবুল হাকামের উপর তোমার কণ্ঠ উঁচু কোরো না; ইনি এই জনপদের প্রধান!' সাদ তখন উমাইয়াকে শুনিয়ে দিলেন কঠিন সত্যটি; বললেন-'উমাইয়া, চুপ করো! আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তুমি তাঁর সাহাবীদের হাতে নিহত হবে!' উমাইয়া

কেঁপে উঠে বললো-'আমি কি মক্কায় মারা যাবো?' সাদ বললেন- 'আমার জানা নেই, তুমি কোথায় এবং কখন মারা যাবে!' উমাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। বলে- 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা বলে না।' এরপর ঘরে ফিরে উমাইয়া স্ত্রীকে সব বলে এবং পণ করে, আর কখনো মক্কা থেকে বের হবে না।৪

কিন্তু আবু জাহল এখন বলপ্রয়োগ করে। বারবার জোর-জবরদস্তি করে। বলে-'তুমি যদি না যাও, তোমার দেখাদেখি অন্যরাও যাবে না!' তারপর আশ্বাস দিয়ে বলে-'হে আবু সাফওয়ান, তোমার জন্য খুব সুন্দর এবং দ্রুতগামী অশ্ব ক্রয় করা হবে।' উমাইয়াকে রাজি হতে হয়। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সফরের আসবাবপত্র প্রস্তুত করতে বললে তার স্ত্রী বলে-'হে আবু সাফওয়ান, তোমার কি মদীনার ভাইয়ের কথা স্মরণ নেই?' উমাইয়া বলে- 'আমার ইচ্ছা, অল্প কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসবো।'

উমাইয়া এ আশায় যুদ্ধগামী দলটির সাথে যোগ দেয়। মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবু লাহাব ব্যতীত সকলেই অংশগ্রহণ করে। আবু লাহাব নিজের পরিবর্তে অন্য একজনকে প্রেরণ করে। আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের যুবকরাও কুরাইশ-সেনাদলে যোগ দেয়। কুরাইশ গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বনু আদী ব্যতীত অন্য কোনো গোত্র পেছনে থাকেনি। বনু আদী গোত্রের কেউ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

একশত ঘোড়া, তিনশো লৌহবর্ম, অগণিত উট এবং প্রায় তেরোশো সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে অধিনায়ক আবু জাহল ইবনে হিশাম তৈরি হয়। কিন্তু রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ কুরাইশদের মনে পড়ে-বনু বকর গোত্রের সাথে তাদের শত্রুতা ও যুদ্ধ চলছে; এরা যদি পেছন থেকে তাদের উপর হামলা করে, তবে তারা দুই বিপদের মধ্যখানে পড়ে যাবে। ব্যাপারটা হঠাৎ সামনে আসায় আলোচনা-পর্যালোচনার ফলে সামরিক এই অভিযান স্থগিত হওয়ার উপক্রম হয়।

ইবলিস দেখলো সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি বনু কিনানা গোত্রের সর্দার সুরাকা বিন মালিকের চেহারা ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে কুরাইশ-নেতাদের বললো- 'আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বনু কিনানা পেছন থেকে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করতে

পারবে না!' এ কথার পরে আর ভাবনার কিছু রইলো না। এগিয়ে চললো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্রোধে অধীর রণকুশলী যোদ্ধারা।

দ্রুত গতিতে বদর প্রান্তরের দিকে তারা প্রায় উড়ে চললো। একসময় উসফান ও কুদাইদ প্রান্তর অতিক্রম করে তারা যুহাফা নামক স্থানে পৌঁছলো। সেখানে আবু সুফিয়ানের প্রেরিত নতুন এক খবর এসে পৌঁছলো। আবু সুফিয়ান জানালো-'আপনারা আপনাদের যে কাফেলা ও সম্পদ রক্ষার জন্য বের হয়েছিলেন, তা আল্লাহ হেফাজত করেছেন। সুতরাং আপনারা যেখানে আছেন, সেখান থেকে মক্কায় ফিরে যান।'

আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে বদর প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছার পর মাজদী ইবনে আমর নামে এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তাকে মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মাজদী বলে-'তেমন কিছু তো চোখে পড়েনি, তবে দুজন লোক দেখেছি। তারা পাহাড়ি টিলার কাছে উট বসিয়েছে, এরপর কুয়া থেকে পানি তুলে চলে গেছে।'

আবু সুফিয়ান তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে উটের মল থেকে খেজুরের বিচি পরীক্ষা করে বলে-'নিঃসন্দেহে এ খেজুর ইয়াসরিবের।' এর পরপরই সে নিজের কাফেলার কাছে ছুটে গিয়ে মক্কাগামী মূল পথ ছেড়ে সোজা দক্ষিণে গিয়ে সামনে অগ্রসর হয় এবং মুসলিম বাহিনীর নাগাল থেকে বেরিয়ে যায়।

এ খবর পেয়ে মুশরিক বাহিনীর সৈন্যরা ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। কিন্তু আবু জাহল অহংকারের সাথে রুখে দাঁড়ায়। সে চিৎকার করে বলে-'আল্লাহর কসম, বদর প্রান্তর দেখার আগ পর্যন্ত ফিরবো না। সেখানে গিয়ে তিন দিন অবস্থান করবো। এই সময়ে উট জবাই করবো, লোকদের ডেকে এনে আহার করাবো, মদ পান করবো, দাসীরা আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য গান গাইবে। এর ফলে সমগ্র আরবে আমাদের এই সফরের খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং চিরকালের জন্য সবার মনে আমাদের সফর-বিবরণী উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আখনাস নামক একজন বিশিষ্ট নেতা তার কথার প্রতিবাদ করে উঠলেন। কিন্তু আবু জাহল তার কথায় কর্ণপাত করলো না। আখনাস তখন মিত্র গোত্র বনু যোহরার

লোকসহ তার অনুসারী তিনশত সৈন্য নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন। বন্ধু যোহরা গোত্রের কোনো লোক বদর যুদ্ধে অংশ নিলো না।৫

বনু যোহরা গোত্রের লোকেরা ফিরে যাওয়ার পর বনু হাশিমও ফিরে যেতে চাইলে আবু জাহল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো-'আমাদের ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ ফিরে যেতে পারবে না।' এরপর আবু জাহল সঙ্গের এক হাজার সৈন্য নিয়ে বদর অভিমুখে রওনা হলো। চলতে চলতে তারা বদরের উপকণ্ঠে এসে বদর উপত্যকার সীমান্তে ওয়াদিয়ে কুসওয়ার একটি টিলার আড়ালে অবস্থান নিলো।

আবু সুফিয়ানের নিরাপদে ফিরে যাওয়া এবং মক্কি বাহিনীর বদর প্রান্তরে উপস্থিত হওয়ার খবর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়লেন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে! যদি মক্কি বাহিনীকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে পরিণামে কুরাইশদের দাপট বেড়ে যাবে এবং তাদের জয়জয়কার মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হবে; এতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। বিপরীতে মুসলমানদের আওয়াজ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ইসলাম হয়ে পড়বে শক্তিহীন। ইসলামের শত্রুরা এবং ইসলাম সম্পর্কে যারা ভালোভাবে জানা ও বোঝার সুযোগ পায়নি, তারা ইসলামের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করবে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুতায় নেমে পড়বে।

আর যদি যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসেন, তবে সমস্যা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীরা এত বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্যার সমাধান করতে সাহাবীদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। বৈঠকে সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মুসলিম বাহিনীর বড় বড় সর্দার ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন।

নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম ও সামরিক নেতাদের মতামত চাওয়া হলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন- 'যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়াই ভালো হবে বলে মনে করি।' হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এমন মনোভাব প্রকাশ করলেন।

এরপর উঠে দাঁড়ালেন মিকদাদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন, তার উপর আপনি অবিচল থাকুন; আমরা আপনার সঙ্গে রয়েছি। আল্লাহর শপথ, বনী ইসরাঈল যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলো-"হে মুসা, তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকবো," আমরা আপনাকে এ ধরনের কথা বলবো না; বরং আমরা বলবো-আপনি এবং আপনার পরওয়ারদেগার লড়াই করুন, আমরাও আপনার সাথে লড়ব। সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে বারকে গামাদ পর্যন্ত নিয়ে যান, তবুও আমরা সারা পথ লড়াই করতে করতে আপনার সাথে সেখানে পৌঁছব।' হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশংসা করে তাঁর জন্য দুআ করলেন।

মতপ্রকাশকারী তিন সাহাবী ছিলেন মুহাজির সাহাবী, আর বাহিনীতে আনসাররাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন। কারণ যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব তাঁদের উপরই বেশি ন্যস্ত হবে। তাছাড়া বাইআতে আকাবার আলোকে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে তাঁরা বাধ্য নন। তাই তিনি আনসারদের প্রতি লক্ষ করে বললেন-'হে লোকসকল, তোমাদের কী ইচ্ছা? আমাকে খুলে বলো।'

আনসারদের অধিনায়ক সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদের উদ্দেশ্য করেছেন?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'হ্যাঁ।'

সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- 'আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবই সত্য। আমরা আপনার আনুগত্য করা ও আপনার কথা মান্য করার অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করুন। ওই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দেন, তবে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজন লোকও পেছনে পড়ে

থাকবে না। আগামীকাল আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যধারণ করবো, লড়াইয়ে আমরা জোয়ানি ও তেজোদীপ্ত পৌরুষের প্রমাণ দেবো। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের মাধ্যমে আপনার চোখ জুড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন। আপনি আল্লাহ তাআলার নামে আমাদের নিয়ে সামনে চলুন। '৬

হযরত সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর চমৎকার বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন-'অগ্রসর হও এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুই কাফেলার যে কোনো একটি আমাদের হাতে পরাভূত হবে। আল্লাহর শপথ, আমি যেন এখনই সেই কওমের মৃত্যুঘাট দেখতে পাচ্ছি।'

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে অগ্রসর হন এবং কয়েকটি পাহাড়ি বাঁক, পাহাড়ি জনপদ ও বিশাল টিলা অতিক্রম করে বদর প্রান্তরের কাছাকাছি এসে তাঁবু স্থাপন করেন।

এখানে অবস্থান নেওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চিরকালের বন্ধু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহকে নিয়ে সংবাদ সংগ্রহে বের হন। পথে একজন বৃদ্ধের দেখা পান। নবীজি বৃদ্ধকে কুরাইশ বাহিনী এবং মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উভয় বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কারণ, নবীজি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু বুড়ো বেঁকে বসে। বলে-'আপনারা নিজেদের পরিচয় দিন!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-'আপনার কাছে যা জানতে চেয়েছি, আগে তা বলুন; এরপর আমরা নিজেদের পরিচয় দেবো।'

বৃদ্ধ বলে-'মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা যদি সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে আজ তাদের অমুক জায়গায় থাকার কথা।' এ কথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সেই জায়গার কথা উল্লেখ করে, যেখানে সাহাবীরা আবস্থান করছেন। এরপর বৃদ্ধ বলে-'কুরাইশরা অমুক দিন বেরিয়েছে। সংবাদবাহক যদি আমাকে সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে কুরাইশদের

আজ অমুক স্থানে থাকার কথা।' এ কথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সেই জায়গারই উল্লেখ করে, যেখানে আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা অবস্থান করছে। বৃদ্ধ কথা শেষ করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীর পরিচয় জানতে চায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-'আমরা পানি থেকে এসেছি।' এ কথা বলেই ফিরে আসেন। বৃদ্ধ একা একা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে-'কোন পানি থেকে? ইরাকের পানি থেকে?'

সেদিন শেষ বিকালে শত্রুদের অবস্থান ও অন্যান্য খবর সংগ্রহের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরদের তিনজন নেতা আলী, যুবাইর ইবনে আওয়াম ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে প্রেরণ করেন। এ তিন বিশিষ্ট সাহাবী অন্য কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশ বাহিনীর খবর সংগ্রহ করতে বের হন।

প্রথমে তাঁরা বদরের জলাশয়ের কাছে যান। সেখানে দুই ক্রীতদাস কুরাইশ বাহিনীর জন্য পানি তুলছিলো। সাহাবীরা তাদের পাকড়াও করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন। নবীজি তখন নামায আদায়রত ছিলেন। সাহাবীরা গ্রেফতারকৃত ক্রীতদাসদ্বয়ের কাছে কুরাইশদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

তারা বলে-'আমরা কুরাইশের লোক। তারা আমাদের পানি তুলে নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে।' সাহাবীদের এই জবাব পছন্দ হয় না। তারা ধারণা করেন যে, এরা আবু সুফিয়ানের লোক হবে। কেননা তাদের মনে তখনো একটা ক্ষীণ আশা ছিলো যে, বাণিজ্য-কাফেলা অধিকার করা যাবে। সাহাবীরা উভয় ক্রীতদাসকে মারধর শুরু করেন। মার খেয়ে ওরা বাধ্য হয়ে বলে- 'হ্যাঁ, আমরা আবু সুফিয়ানের লোক।' এ কথা শোনার পর প্রহার বন্ধ করা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে মারধর করার কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সাহাবীদের বলেন- 'ওরা যখন সত্য বলেছে, তখন তোমরা তাদের প্রহার করেছো আর যখন মিথ্যা কথা বলেছে, তখন ছেড়ে দিয়েছো। আল্লাহর শপথ, ওরা সত্য বলেছে। ওরা কুরাইশেরই লোক!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর ক্রীতদাসদের বলেন-'আচ্ছা, তোমরা এবার আমাকে কুরাইশদের সম্পর্কে কিছু বলো।' তারা বলে-'প্রান্তরের শেষ সীমায় যে টিলা দেখা যাচ্ছে, কুরাইশরা তার পেছনে রয়েছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যসংখ্যা জানতে চান। ওরা বলে-'আমরা জানি না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন- 'প্রতিদিন কয়টি উট ওরা জবাই করে?' ওরা উত্তর দেয়- 'একদিন নয়টি এবং একদিন দশটি।' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল বলেন-'লোকসংখ্যা নয়শত থেকে এক হাজারের মধ্যে হবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর জিজ্ঞেস করেন- 'ওদের মধ্যে কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কারা রয়েছে?' তারা বলে- 'রবীআর উভয় ছেলে উতবা ও শায়বা, আবুল বাখতারী ইবনে হিশাম, হাকীম ইবনে হিযাম, নওফেল ইবনে খুওয়াইলিদ, হারিস ইবনে আমর, তুআইমা ইবনে আদী, নাযার ইবনে হারিস, যামআ ইবনে আসওয়াদ, আবু জাহল ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালাফ...' তারা আরো কয়েকজনের নাম বলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের প্রতি লক্ষ করে বলেন-'মক্কা তার বড় বড় সন্তানদের তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছে!’ সেই রাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বৃষ্টিবর্ষণ করেন। বৃষ্টি কাফেরদের উপর

মুষলধারে বর্ষিত হয়, এতে তাদের অগ্রাভিযানে বাধা সৃষ্টি হয়; আর মুসলমানদের জন্য তা ছিলো রহমতের ঝরনাধারা। পায়ের নিচের বালুতে আগে পা দেবে যেতো। বৃষ্টির পানিতে পায়ের নিচের বালুকা শক্ত হয় এবং পা রাখার মতো চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। তা দেখে সাহাবীদের মন মজবুত হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর মুসলিম নেতাদের সঙ্গে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। মুশরিকদের আগেই বদরের জলাশয়ের কাছে পৌঁছার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

এ সময় হুবাব ইবনে মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সেনানায়কের মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দেন।

প্রথমে তিনি জিজ্ঞেস করেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন জায়গায় সমবেত হয়েছেন যে, সামনে-পেছনে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এটা কি আল্লাহর আদেশে, নাকি রণকৌশল হিসেবে আপনি এই জায়গা পছন্দ করেছেন?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'এটা রণকৌশল।' এ কথা শুনে তিনি বলেন-'এই জায়গায় অবস্থান আমি সমীচীন মনে করি না। আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে এবং কুরাইশদের অবস্থানের সবচেয়ে নিকটবর্তী জলাশয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অন্যান্য জলাশয়ের উপর আমরা নজর রাখবো। যুদ্ধ শুরু হলে আমরা পানি পান করবো, কিন্তু কুরাইশরা পানির অভাবে ছটফট করবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-'তুমি যথার্থ পরামর্শই দিয়েছো!' এরপর তিনি সৈন্যদের নিয়ে জলাশয়ের কাছে পৌঁছে তাঁবু ফেলেন। সাহাবীরা হাউজ বানিয়ে তাতে পানি ভর্তি করে কূপ বন্ধ করে দেন।

সাহাবীরা জলাশয়ের কাছে অবস্থান নেওয়ার পর সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন-'হে আল্লাহর রাসূল, একটি সুরক্ষিত তাঁবু নির্মাণের জন্য আপনি আমাদের নির্দেশ দিন, যেখানে আপনি অবস্থান করবেন। আপনার পাশে বাহন প্রস্তুত থাকবে। এরপর আমরা শত্রুদের মোকাবেলা করবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্মান দিলে এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী করলে আমাদের আশা পূর্ণ হবে। আর যদি না হয়, তবে আপনি সওয়ারিতে আরোহণ করে সেই সব লোকের কাছে যেতে পারবেন, যারা পেছনে রয়েছে।

হে আল্লাহর নবী, আপনার পেছনে এমন বহু মুসলমান রয়েছে, যারা
আপনাকে আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারা যদি জানতো যে, আপনি যুদ্ধের মুখোমুখি হবেন, তাহলে তারা কিছুতেই পেছনে থাকতো না। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে আপনার হেফাজত করবেন। ওরা আপনার কল্যাণকারী হবে এবং আপনার

সঙ্গে জিহাদ করবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা করে তাঁর জন্য দুআ করেন।

মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি উঁচু টিলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি তাঁবু তৈরি করে দেন, যেখানে বসে পুরো রণাঙ্গন চোখে পড়ে। নবীজির প্রতি লক্ষ রাখার জন্য সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একদল আনসার যুবককে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর সেনা বিন্যাস করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়ে যান। সেখানে পৌঁছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের ইশারা করে দেখিয়ে বলেন- 'আগামীকাল ইনশাআল্লাহ এই জায়গা হবে অমুকের বধ্যভূমি এবং এই জায়গা হবে অমুকের বধ্যভূমি।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে একটি গাছের শেকড়ের কাছে রাত্রিযাপনের প্রস্তুতি নেন। সাহাবীরাও নিরুদ্বেগ প্রশান্তির সাথে ঘুমিয়ে পড়েন। তাদের অন্তরে ছিলো আত্মবিশ্বাস এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের নিশ্চয়তা। তাদের মনে প্রত্যাশা ছিলো যে, সকালে নিজ চোখে মহান প্রতিপালকের সুসংবাদের প্রমাণ দেখতে পাবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে সাহাবীদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন। জেগে থাকেন শুধু আল্লাহর রাসূল। সারা রাত তিনি আল্লাহর দরবারে দুআ ও কান্নাকাটি করেন।

রাসূলের সাথে সাথে জেগে থাকে বদর প্রান্তরও, আল্লাহর সৈনিকদের জেগে ওঠার অপেক্ষায়।

বদর যুদ্ধ

'হে আল্লাহর বান্দারা, নামাযের সময় হয়েছে।' সুবহে সাদিকের সময় ভেসে আসে রাসূলের আওয়াজ। একটি বৃক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন। ১

ধীরে ধীরে অন্ধকার দূর করে উপস্থিত হয় আলোঝলমল সকাল। সকালের স্নিগ্ধতা মরু-দুনিয়ায় খুবই অল্প সময় স্থায়ী হয়। কিন্তু আজকের সকালে যেন স্নিগ্ধতার সামান্য ছোঁয়াও নেই। বদর প্রান্তরে অস্থিরতা। দূর থেকে মৃত্যু যেন নিষ্ঠুরের মতো ডঙ্কা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে। কার জীবনের শেষ দিন আজ? সুস্বাগতম জানিয়ে ডানাওয়ালা ফেরেশতা কাকে নিয়ে যাবে জান্নাতি জগতে? কার আত্মাকে ধিক্কার দিয়ে নিক্ষেপ করা হবে আগুনের অতলে?

ভোরের আলো ফোটার পর টিলার ওপাশ থেকে এপাশে এসে সমবেত হয় কুরাইশরা। তাদের একদল এগিয়ে আসে মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি দখলকৃত হাউজের দিকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যোদ্ধাদের বলেন-'

তাদেরকে তোমরা কেউ কিছু বোলো না!'

তাদের নেতা আবু জাহল মুসলমানদের শক্তি পরিমাপ করার জন্য উমাইর ইবনে ওয়াহাব জুমাহীকে প্রেরণ করে। উমাইর এক চক্কর দিয়ে ফিরে গিয়ে জানায়- 'মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা তিনশত বা তার কিছু কম-বেশি হবে।' তারপর আবার বেশ কিছু দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এসে উমাইর বলে-'তাদের সহায়ক কোন সৈন্য মুসলমানরা পেছনে রেখে আসেনি। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি যে, ইয়াসরিবের উটগুলো নির্ভেজাল মৃত্যু বহন করে নিয়ে এসেছে। ওদের সমুদয় শক্তি তলোয়ারের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর শপথ, আমি যা বুঝেছি, এতে মনে হয়েছে যে, ওরা কেউ তোমাদের না মেরে মরবে না। যদি তোমাদের বিশিষ্ট লোকদের ওরা মেরেই ফেলে, তবে তোমরা বিশিষ্ট সঙ্গীহারা হয়ে যাবে। কাজেই যুদ্ধ করার আগে আরেকবার ভালো করে ভেবে নাও।'

যুদ্ধ না করেই মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য আবু জাহলের বিরোধিতা করলো হাকীম ইবনে হিযাম। সে এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে বোঝাতে শুরু করলো।

প্রথমে গেলো উতবা ইবনে রবীআর কাছে; বললো- 'হে আবুল ওয়ালীদ, আপনি কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনার আনুগত্য সবাই বিনা বাক্যে মেনে নেয়। আপনি শেষ সময়ে একটি ভালো কাজ করুন। এর ফলে সব সময় আপনার আলোচনা মানুষের মুখে মুখে থাকবে।' উতবা বললো- 'কী কাজ, হাকীম?' হাকীম বললো- 'আপনি আপনার লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর নাখলার সারিয়্যায় নিহত আপনার মিত্র আমর ইবনে হাযরামীর ব্যাপারটা আপনি নিজের উপর নিন।' উতবা বললো- 'আমি রাজি আছি। কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে জিম্মাদার থাকবে, সে আমার মিত্র। তার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব আমার উপরই বর্তায়। তার যে সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে, আমি তারও জিম্মাদার।'

এরপর উতবা হাকীম ইবনে হিযামকে বললো- 'তুমি হানযালিয়ার ছেলের কাছে যাও। মানুষের মস্তিষ্ক বিগড়ে দিতে এবং তাদের মন ঘুরিয়ে দিতে তারচেয়ে অধিক পারঙ্গম আর কেউ নেই।' এরপর উতবা ইবনে রবীআ দাঁড়িয়ে কুরাইশদের মধ্যে বক্তৃতার ভঙ্গিতে নিজের মত তুলে ধরে। হাজ

আর হাকীম ইবনে হিযাম হানযালিয়ার ছেলে আবু জাহলের কাছে গিয়ে দেখলো, সে নিজের বর্ম পরিষ্কার করছে। হাকীম তাকে উতবার পয়গাম শোনালো। শুনেই আবু জাহল রেগে গেলো; বললো- 'খোদার কসম, মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের দেখে উতবার বুক শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আমি কিছুতেই মক্কায় ফিরে যাবো না। খোদা তাআলা মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে একটা ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমরা মক্কায় ফিরে যাবো না। উতবা যা কিছু বলেছে, সেটা এজন্যই বলেছে যে, সে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। উতবার পুত্রও মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে, এ কারণে সে ওদের ব্যাপারে তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে!'

উতবা এ কথাগুলো শুনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিয়ে বললো-'আবুল হাকাম শীঘ্রই জানতে পারবে, কার বুক শুকিয়ে গেছে-আমার, না তার!'

আবু জাহল উতবার এই প্রতিক্রিয়ার খবরে ভয় পেয়ে গেলো। সে নাখলার সারিয়্যায় নিহত আমর বিন হাযরামীর ভাই আমের বিন হাযরামীকে ডেকে পাঠালো। সে এলে তাকে উসকে দেওয়ার জন্য বললো- 'তোমাদের মিত্র উতবা লোকদের ফিরিয়ে নিতে চায়, অথচ তোমাদের চোখে-মুখে আজও প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। নিজেদের উপর অত্যাচার ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও!'

এ কথা শুনে আমের উঠে দাঁড়ালো এবং রীতি অনুযায়ী নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করলো- 'হায় আমর! হায় আমর! হায় আমর!' এই চিৎকার শুনে সবাই জড়ো হলো। লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

উতবা যে আহ্বান জানিয়েছিলো, সেটা ব্যর্থ হলো। এমনি করে হুঁশের উপর জোশ জয়ী হলো এবং যুদ্ধ না করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো।২ অমুসলিমরা দলে দলে বেরিয়ে এলো এবং উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন-'হে আল্লাহ, কুরাইশরা পরিপূর্ণ অহংকারের সাথে তোমার বিরোধিতা করতে এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এগিয়ে এসেছে। হে আল্লাহ, আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের বড় বেশি প্রয়োজন। হে আল্লাহ, তুমি আজ ওদের ছিন্নভিন্ন করে দাও!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবাকে তার লাল উটের উপর দেখে বললেন- 'কওমের কারো কাছে যদি কল্যাণ থাকে, তবে লাল উটের আরোহীর কাছে রয়েছে। অন্যরা যদি তার কথা মেনে নিতো, তবে সঠিক পথপ্রাপ্ত হতো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের কাতারবন্দি করতে শুরু করলেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি তীর। সেটার সাহায্যে তিনি কাতার সোজা করছিলেন। সাওয়াদ

ইবনে গাযিয়া কাতার থেকে একটুখানি সামনে এগিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের তীর দিয়ে তাঁর পেটে সামান্য খোঁচা দিয়ে বললেন- 'সাওয়াদ, সোজা হয়ে দাঁড়াও!' সাওয়াদ তৎক্ষণাৎ বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার পেটে খোঁচা দিয়েছেন, আমি ব্যথা পেয়েছি। আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পেটের উপর থেকে জামা সরিয়ে বললেন-'ঠিক আছে, প্রতিশোধ নাও।' সাওয়াদ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পবিত্র পেটে চুম্বন করলেন এবং বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, মনে হয়, এটাই শেষ সাক্ষাৎ!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওয়াদের কল্যাণের জন্য দুআ করলেন। ৩

কাতার সোজা করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ পাওয়ার আগে কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ পথনির্দেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন- 'পৌত্তলিকরা যখন দলবদ্ধভাবে তোমাদের কাছে আসবে, তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। তীরের অপচয় যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবে। তোমাদের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত তরবারি চালনা করবে না।'

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে নিজের অবস্থান-কেন্দ্রে চলে গেলেন।
সাদ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রিয় নবীর পাহারায় নিন্মুক্ত হলেন।

অন্যদিকে মুশরিক আবু জাহল আল্লাহর কাছে ফয়সালার জন্য দুআ করতে থাকলো। তার দুআর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে বলেন-'তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের কাছে এসেছে। যদি তোমরা বিরত হও, তবে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা পুনরায় তা করো, তবে আমিও তোমাদের শাস্তি দেবো এবং তোমাদের দল অধিক হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সঙ্গে রয়েছেন।'

(সূরা আনফাল : ১৯)

যুদ্ধের ময়দানে টানটান উত্তেজনা। এক হাজার যোদ্ধার মুখোমুখি মাত্র তিনশো যোদ্ধা। পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আর চাচা ভাতিজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। সত্য আজ মিথ্যার মুখোমুখি হয়েছে।

যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন দেয় আসওয়াদ ইবনে আবুল আসাদ মাখযুমী। এই লোকটি দারুণ সাহসী, কিন্তু দুর্বৃত্ত এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী। ময়দানে বেরোতে বেরোতে সে বলে-'আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি যে, ওদের হাউজের পানি পান করবো, নতুবা সেই হাউজকে ধ্বংস করবো অথবা তার সামনে প্রাণ বিলিয়ে দেবো!'

আসওয়াদ এগিয়ে এলো। অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে এলেন। জলাশয়ের কাছে উভয়ের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, কাফের আসওয়াদের পা হাঁটুর নিচ দিয়ে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলো। কর্তিত পা থেকে অবিরাম ধারায় রক্ত বেরোতে লাগলো। সেই রক্তধারা তার সঙ্গীদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিলো। আসওয়াদ হামাগুড়ি দিয়ে জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। জলাশয়ের কাছে পৌঁছে জলাশয়ের পানি পান করে তার কসম পূর্ণ করতে চাচ্ছিলো। এমন সময় হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু আসওয়াদের উপর পুনরায় আঘাত করলে সে জলাশয়ের ভেতরে পড়ে মরলো।

আসওয়াদ ইবনে আবুল আসাদের হত্যার পর যুদ্ধের আগুন পুরো ময়দানে ছড়িয়ে পড়লো। মুশরিক বাহিনীর মধ্য থেকে একই গোত্রের তিনজন বিশিষ্ট যোদ্ধা বেরিয়ে এলো। দুই ভাই উতবা বিন রবীআ ও শায়বা বিন রবীআ এবং উতবার পুত্র ওয়ালীদ। এরা কাতার থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান জানালো।

আউফ, মুআওয়িয ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নামক তিনজন আনসার যুবক অগ্রসর হলেন। আউফ ও মুআওয়িয দুই ভাই। তারা মোট সাত ভাই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।৫

কুরাইশরা জিজ্ঞেস করলো- 'আপনাদের পরিচয় কী?' তাঁরা বললেন-'আমরা মদীনার অধিবাসী।' কুরাইশরা বললো- 'আপনারা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরা চাই আমাদের চাচাতো ভাইদের।'

এরপর তিন কুরাইশ চিৎকার করে বললো-'হে মুহাম্মাদ, আমাদের কাছে আমাদের রক্তসম্পর্কীয়দের পাঠাও।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'উবাইদা ইবনে হারিস, হামযা ও আলী এগিয়ে যাও।'

তাঁরা এগিয়ে গেলে কুরাইশ যুবকরা তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো, যেন তারা তাঁদের চেনে না! তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। কুরাইশরা বললো-'হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, আপনারা অভিজাত প্রতিদ্বন্দ্বী।'

শুরু হয় ছয়জনের লড়াই। উবাইদা ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু উতবা ইবনে রবীআর সাথে, হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু শায়বার সাথে আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালীদ ইবনে উতবার সাথে মোকাবেলা করলেন। ৬

হযরত হামযা ও হযরত আলী নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করে ফেললেন, কিন্তু উবাইদা ইবনে হারিস ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উতবার মধ্যে আঘাত-বিনিময় হলো। তারা একে অন্যকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেললেন। ইতিমধ্যে হামযা ও আলী তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজ শেষ করে উবাইদার সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং উতবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খতম করে ফেললেন। উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পা থেকে রক্ত পড়ছিলো। তাঁরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন।

পৌত্তলিকদের দুর্ভাগ্যের সূচনা হলো। একসাথে তিনজন বিশিষ্ট যোদ্ধাকে তারা হারালো। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে বর্মে সুসজ্জিত শত শত সৈন্য তলোয়ার নিয়ে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলমানদের উপর। মুসলমানরা তাদের মহান প্রতিপালকের কাছে সাহায্যের জন্য দুআ করে দৃঢ়তার সাথে কাফেরদের হামলা মোকাবেলা করতে লাগলেন। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে বিধর্মীদের উপর পাল্টা হামলা চালালেন।

তরবারির ঝনঝন আর সৈনিকদের গর্জন-চিৎকারে কেঁপে উঠলো চারদিক।

দহরে নবী সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করে সেজদায় পড়ে গেলেন। শত শত সৈন্যের মুখোমুখি তাঁর সামান্য সংখ্যক সৈন্য।

তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন-'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।' অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে সকাতর কণ্ঠে বললেন-'হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যদি আপনি চান, তবে আপনার ইবাদত চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।'

তিনি কখনো সেজদায় মাথা ঠেকিয়ে, কখনো হাত তুলে দুআ করতেই থাকলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে কিছুক্ষণ পরপর যতবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এলেন, দেখলেন, তিনি সেজদায় পড়ে রয়েছেন।

আল্লাহর দরবারে আকুল হয়ে ফরিয়াদের সময় তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চাদর ঠিক করে দিলেন এবং তাঁর কাতর অবস্থা দেখে বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, যথেষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন!'

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের ফরিয়াদ গ্রহণ করে প্রতিশ্রুত সাহায্য পাঠিয়ে দিলেন। আকাশ থেকে নেমে এলেন আল্লাহর ফেরেশতারা।

কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় হয়ে রইলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর মাথা তুলে বললেন-'আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে! ওই দেখো, জিবরীল ঘোড়ার লাগাম ধরে আসছেন আর তার চারপাশে ধুলোবালি উড়ছে!'৭

তারপর বর্মপরিহিত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবুর বাইরে এলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হতে হতে বললেন-'এই দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।'

(সূরা কামার: ৪৫)

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুঠো ধূলি হাতে নিয়ে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করে বললেন- 'শাহাতিল উজুহ-ওদের চেহারা আচ্ছন্ন হোক।' রহমানুর রহীমের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত ধূলির কণা প্রত্যেক কাফেরের চোখ, মুখ, নাক ও গলায় প্রবেশ করলো। তাদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম যোদ্ধাদের জবাবি হামলার নির্দেশ এবং যুদ্ধের তাগিদ দিয়ে বললেন- 'তোমরা এগিয়ে যাও। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তোমাদের যে কেউ দৃঢ়তার সাথে পুণ্যের কাজ মনে করে অগ্রগামী হয়ে পেছনে সরে না এসে যুদ্ধ করবে এবং মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।'

যুদ্ধের আসল অস্ত্র হলো সাহস। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের হৃদয় উদ্দীপিত করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বললেন-'সেই জান্নাতের প্রতি ওঠো, যার দিগন্ত ও বিস্তৃতি আকাশ ও মাটির সমপরিমাণ।' এ কথা শুনে উমাইর বলে উঠলেন-'বাহ, বাহ!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'বাহ' বলার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, অন্য কোনো কারণে নয়, আমি আশা করছিলাম যে, আমিও যদি সে জান্নাতের অধিবাসী হতে পারতাম!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'সে সব জান্নাতির মধ্যে তুমিও রয়েছো।' উমাইর কয়েকটি খেজুর বের করেছিলেন খাওয়ার জন্য। কিন্তু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন-'এই খেজুরগুলো খেতে অনেক সময় প্রয়োজন। জীবনকে এত দীর্ঘায়িত করবো কেন!' তিনি খেজুর ছুড়ে ফেললেন এবং যুদ্ধরত সৈন্যদের কাতারে মিশে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

যখন শত্রুদের উপর হামলার তীব্রতা কমে গেলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবি হামলার নির্দেশ দেন। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাতে ভাটা পড়েছিলো, কিন্তু হামলার নির্দেশে তাদের অবস্থান আবার দৃঢ় হয়।

সাহাবায়ে কেরাম এ সময় কাফেরদের কাতার এলোমেলো করে তাদের শিরশ্ছেদ করতে করতে এগিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বর্ম পরিধান করে রণক্ষেত্রে আছেন দেখে সাহাবীদের উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায়। তারা বীরবিক্রমে লড়াই অব্যাহত রাখেন। এদিকে ফেরেশতারাও সাহায্য শুরু করেন।

যোদ্ধাদের শোরগোল আর আহতদের চিৎকারে মুশরিকদের জন্য হঠাৎ বিভীষিকাময় হয়ে উঠে বদর প্রান্তর। মুশরিক সৈন্যদের মাথা কেটে পড়ছে অথচ বোঝা যাচ্ছে না, কে তাকে মেরেছে! মুশরিকদের হাত কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, অথচ কে তাদের হাত কেটেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না!

একজন আনসারী মুসলমান এক মুশরিককে দৌড়াতে শুরু করলেন। হঠাৎ চাবুকের আঘাতের শব্দ শোনা গেলো। অদৃশ্য একজন তার ঘোড়াকে সম্বোধন করে বললেন- 'হে হাইয়ুম, অগ্রসর হও!' এরপর সাহাবী দেখলেন, কারো আঘাতে পৌত্তলিক চিৎপাত হয়ে পড়ে গেছে। তার নাকে-মুখে আঘাতের চিহ্ন! চেহারা রক্তাক্ত! দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

কালমানদের প্রতি আসমান থেকে এটি ছিলো তৃতীয় সাহায্য ৮

একজন সাহাবী এক মুশরিককে মারার জন্য দৌড়াতে শুরু করলে তার গলায় সাহাবীর তলোয়ার পৌঁছার আগেই মুশরিকের কর্তিত মস্তক মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। সাহাবী বুঝতে পারেন, এই কাফেরকে অন্য কেউ হত্যা করেছে!

এক হালকা-পাতলা আনসারী সাহাবী রাসূলের সুঠামদেহী চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে গ্রেফতার করে রাসূলের সামনে উপস্থিত হন। আব্বাস বলেন-'আল্লাহর শপথ, আমাকে তো এই লোকটি কয়েদ করে নিয়ে আসেনি। আমাকে মুণ্ডিত মস্তকের

এক লোক বন্দি করে নিয়ে এসেছে! সুদর্শন সেই লোকটি একটি চিত্রল ঘোড়ার পিঠে আসীন ছিলো। এখন তো তাকে এদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।' আনসারী বললেন- 'হে আল্লাহর রাসূল, তাকে তো আমি গ্রেফতার করেছি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'আল্লাহ তাআলা একজন সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাকে সাহায্যে করেছেন।'

আবু বকর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'তোমাদের একজনের সঙ্গে জিবরীল আলাইহিস সালাম, আরেকজনের সঙ্গে মিকাঈল আলাইহিস সালাম রয়েছেন। আর ইসরাফিল আলাইহিস সালামও বিশাল ফেরেশতা, যিনি ময়দানে এসেছেন।'৯

মুসলমানদের সাহায্যে এ সব ফেরেশতা মাঠে নেমে আসার আগে মুশরিকদের সাহায্যের জন্য তাদের সাথে ছিলো অভিশপ্ত শয়তান। সে সুরাকা ইবনে মালিকের রূপ ধরে ময়দানে ছিলো। সে যখন দেখলো, ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ফেরেশতা নেমে আসছেন আকাশ থেকে, তখন ছুটে পালাতে চাইলো। কিন্তু হারিস ইবনে হিশাম তাকে ধরে ফেললো।

সে তো ভেবেছে, লোকটি সুরাকা ইবনে মালিক। কিন্তু ইবলিস হারিসের বুকে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারলো। হারিস মাটিতে পড়ে গেলো। মুশরিকরা বললো-

'সুরাকা কোথায় যাচ্ছো? তুমি কি বলোনি যে, আমাদের সাহায্যে করবে, আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে না?'

সুরাকারূপী ইবলিস বললো- 'আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো না। আল্লাহকে আমার ভয় হচ্ছে, তিনি কঠোর শাস্তিদাতা!' এ কথা বলে শয়তান যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে সুদূর সমুদ্রে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে আর জালেমদের মুখের উপর দ্রুত বন্ধ হয়ে যায় পৃথিবীর প্রতিটি কপাট ।

বিজয়ের সুর

বদর প্রান্তরে চলছে লড়াই। এমন সময় উকাশা ইবনে মুহসিন আসাদীর তলোয়ার ভেঙে গেলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলেন। নবীজি তাঁকে এক টুকরো কাঠ দিয়ে বললেন- 'উকাশা, এটি দিয়ে লড়াই করো।' উকাশা কাঠখণ্ড হাতে নিয়ে সামান্য ঝাঁকুনি দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা লম্বা শুভ্র লৌহনির্মিত একটি শানিত তলোয়ারে পরিণত হলো। উকাশা মহা আনন্দে আশ্চর্য তলোয়ার নিয়ে আবার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অমুসলিম বাহিনীর ব্যর্থতার সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠলো।

মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। কাফের কুরাইশদের মনে হতাশা ছেয়ে গেলো এবং তারা পিছু হটতে লাগলো। পিতা পুত্রের মুখোমুখি, ভাই ভাইয়ের মুখোমুখি এ এক বিস্ময়কর যুদ্ধ!

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিক বাহিনীতে তাঁর পুত্র আবদুর রহমানকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন-'এই খবিস, আমার ধনসম্পদ কী করেছিস?' আবদুর রহমান বললো- 'হাতিয়ার, ঘোড়া আর সেই তলোয়ার ছাড়া কিছু বাকি নেই, যা বুড়ো বয়সের গোমরাহির ইতি ঘটায়।'

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরার মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করেন। এমন এক আদর্শের জন্য তিনি বিনা দ্বিধায় সম্পর্ককে বিসর্জন দেন, যে আদর্শ পুরো মানবজাতির জন্য গড়ে তুলবে শান্তির পৃথিবী।

এক সাহাবীর দেখা হয় আবুল বাখতারীর সাথে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিষেধ করে বলেছিলেন- 'আমি জানি, বনু হাশিমসহ কয়েকটি গোত্রের লোককে জোর করে যুদ্ধের ময়দানে আনা হয়েছে। আমাদের যুদ্ধের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই হাশিম গোত্রের কোনো লোক যদি কারো সামনে পড়ে যায়, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আর আবুল বাখতারী ইবনে হিশাম যদি কারো

সামনে পড়ে যায়, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব যদি কারো নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, তবে তাকেও

যেন হত্যা না করা হয়। কেননা তাকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে!'

আবুল বাখতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করার কারণ-মক্কায় এই লোকটি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়নি। তার পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর কোনো কথাও শোনা যায়নি। এছাড়াও শিয়াবে আবু তালিব উপত্যকার বন্দিজীবনে বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের বয়কট প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে লোকটি ছিলো অন্যতম।

কিন্তু আবুল বাখতারীর ভাগ্য মন্দ। সাহাবী মুজাযযার বিন যিয়াদের সাথে মুখোমুখি হলে মুজাযযার বাধ্য হয়ে তার উপর আক্রমণ চালান। আবুল বাখতারীর সাথে তার একজন সঙ্গীও ছিলো। উভয়ে পাশাপাশি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো। আবুল বাখতারীকে দেখে মুজাযযার রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন-'হে আবুল বাখতারী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' আবুল বাখতারী বলে- 'আমার সঙ্গীকেও?' মুজাযযার বলেন-'না!' আবুল বাখতারী বলে- 'খোদার শপথ, তাহলে আমরা দুজনেই মরবো।' এরপর উভয়ে মুজাযযারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে মুজাযযার রাদিয়াল্লাহু আনহ বাধ্য হয়ে উভয়কে হত্যা করেন।১

কুরাইশ-দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। দুর্বৃত্তদের অধিনায়ক আবু জাহল তার বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সৈন্যদের উদ্দীপিত করার জন্য চিৎকার করে বলতে শুরু করে-'সুরাকার পলায়নে তোমরা সাহস হারিয়ো না, মুহাম্মাদের সাথে তার যোগসাজশ ছিলো। উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ নিহত হয়েছে দেখে তোমরা হিম্মত হারিয়ো না। ওরা তাড়াহুড়ো করেছে। লাত ও উযযার শপথ, ততক্ষণ আমরা ফিরে যাবো না, যতক্ষণ না ওদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবো। দেখো, তোমরা ওদের হত্যা না করে বরং পাকড়াও করো। পরে আমরা ওদের অশুভ তৎপরতার মজা টের পাইয়ে দেবো।'

শিগগির আবু জাহল নিজেই মজা টের পেলো। সৈন্যরা আবু জাহলকে ঘিরে রেখেছিলো। তার চারদিকে ছিলো তীর আর তলোয়ারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। মুসলিম সৈন্যদের প্রচণ্ড হামলায় সেই পাহারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। মুসলমানরা লক্ষ করলেন যে, আবু জাহল একটি ঘোড়ার পিঠে রয়েছে। মৃত্যু তখন পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহ মুসলমানদের কাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর ডানে-বাঁয়ে দুজন আনসার কিশোর। মুআয বিন আমর বিন জুমুহ এবং মুআওয়িয বিন আফরা। পিচ্চিরা আর কতটুকু সাহায্য করবে, এই ভেবে আবদুর রহমান তাঁর পাশে দুই কিশোরের উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করলেন।

কিন্তু হঠাৎ একজন চুপিসারে তাঁকে বললেন- 'চাচাজান, কোন লোকটি আবু জাহল, তা আমাদের দেখিয়ে দিন।' আবদুর রহমান বললেন- 'ভাতিজা, তুমি আবু জাহলকে দিয়ে কী করবে?' কিশোর সাহাবী বললেন-'আমি শুনেছি, আবু জাহল নবীজিকে গালি দেয়। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আবু জাহলকে দেখতে পেলে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে আলাদা হবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যার মৃত্যু আগে লেখা রয়েছে, তার মৃত্যু না হয়।'

আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহ এ কথা শুনে থ হয়ে গেলেন। এরপর অন্যপাশের আনসার কিশোরও তাঁকে চুপিসারে একই কথা বললেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে আবদুর রহমান আবু জাহলকে দেখতে পেয়ে উভয় আনসার কিশোরকে বললেন- 'ওই দেখো, যাকে তোমরা খুঁজছিলে!' এ কথা শোনামাত্র উভয় আনসার কিশোর শিকারি বাজপাখির মতো আবু জাহলের দিকে ছুটে গেলেন। ২

মুআয ইবনে আমর সুযোগ পাওয়ামাত্র আবু জাহলের উপর হামলা করলেন। তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তার পা হাঁটুর নিচ দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ঝরে পড়া খেজুরের মতো উড়ে গেলো তার পা।

ওদিকে সাথে সাথে আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা কিশোর সাহাবীর কাঁধ বরাবর তরবারি দিয়ে আঘাত করলো। কিশোর যোদ্ধার হাতটা কেটে ঝুলে গেলো শরীরের সাথে। এতে লড়াই করতে অসুবিধা হচ্ছিলো। তিনি কর্তিত হাত পেছনে রেখে অপর হাতে তরবারি ঘোরাতে চাইলেন, কিন্তু এতেও অসুবিধা হচ্ছিলো। মুআয তখন হাতের কর্তিত অংশ পায়ের নিচে রেখে এক ঝটকায় হাত থেকে পৃথক করে ফেললেন।

এরপর আবু জাহলের উপর অন্য কিশোর মুআওয়িয বিন আফরা এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন সেখানেই ঢলে পড়লো।

আবু জাহলের শেষ নিঃশ্বাস তখনো বের হয়নি, উভয় কিশোর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 'তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহলকে হত্যা করেছে?' উভয়ে বললেন- 'আমি করেছি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'তোমরা কি তলোয়ারের রক্ত মুছেছো?' তাঁরা বললেন-'না, মুছিনি।' নবীজি উভয়ের তলোয়ার দেখে বললেন-'তোমরা দুজনেই তাকে হত্যা করেছো।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জাহলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র মুআয ইবনে আমরকে প্রদান করলেন, আর মুআওয়িয বিন আফরা পুনরায় যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে শামিল হয়ে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'আবু জাহলের পরিণাম যে দেখতে চাও, দেখে আসো।' সাহাবীরা তখন আবু জাহলের সন্ধান করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহ আবু জাহলকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তখনো তার শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিলো।

তিনি শয়তান লোকটির ধড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্য তার দাড়ি ধরে বললেন-'ওহে আল্লাহর দুশমন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তোকে অপমান করলেন তো?' মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও শয়তান লোকটি অহংকার প্রদর্শন করলো। বললো-'কীভাবে আমাকে অসম্মান করলেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছো, তার চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোনো

মানুষ আছে নাকি? তার চেয়ে বড় আর কে? আহা, আমাকে যদি কিশোর ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করতো!'

এরপর সে জিজ্ঞেস করলো- 'আজ জয়ী হয়েছে কারা?' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- 'আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহলের কাঁধে পা দিয়ে রেখেছিলেন। এতে তার সম্মানে ভীষণ আঘাত লাগলো। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় বকরি চরাতেন। আবু জাহল তাঁকে বললো-'ওরে বকরির রাখাল, তুমি অনেক উঁচু স্থানে পৌঁছে গেছো!'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কথা শেষ হতেই তার মাথা কেটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাজির করে বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, এই হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের মাথা।' নবীজি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন- 'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। ৩

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'চলো, আমাকে তার লাশ দেখাও।' সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু জাহলের লাশের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন-'সে এই উম্মতের ফেরআউন।'৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জাহলের তরবারি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্নকারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে দিলেন।৫

যুদ্ধবাজদের দলপতি নিহত হতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। কুরাইশরা আগেই পালাতে শুরু করেছিলো, বাকি যারা ছিলো তারাও পালাতে শুরু করলো। পালাতে গিয়ে অনেকে বন্দি হলো। এ সময় উমাইয়া ইবনে খালাফ পালাবার পথ না পেয়ে ময়দানের একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। মৃত্যু-ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলো বিশালদেহী লোকটি। রাসূলুল্লাহর

আহ্বানকে সত্যায়ন করেনি সে, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী লোকটি শত ভাগ বিশ্বাস করতো।

এ সময় হঠাৎ সে আবদুর রহমান ইবনে আউফকে দেখতে পেলে তার মনে আশার টিমটিমে আলো জ্বলে উঠলো। এককালে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিলো আবদুর রহমান ইবনে আউফের সাথে। আবদুর রহমান ইবনে আউফ শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েকটি বর্ম নিয়ে যাচ্ছিলেন। উমাইয়া তাকে ডেকে বললো-'আমি কি তোমার প্রয়োজনে আসতে পারি? আমি তোমার বর্মগুলোর চেয়ে উত্তম। আজকের মতো দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন নেই?' অর্থাৎ যে তাকে বন্দি করবে, মুক্তিপণ হিসেবে সে তাকে অনেক দুধেল উটনি দেবে।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্মগুলো ফেলে রেখে উমাইয়া ও তার পুত্র আলীকে গ্রেফতার করলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। উমাইয়া কিছুটা স্বস্তি পেলো। এবারের মতো হয়তো সে বেঁচে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে উমাইয়া বললো-'তোমাদের মধ্যে ওই লোকটি কে ছিলেন, যিনি বুকে উটপাখির পালক লাগিয়ে রেখেছিলেন?' আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন- 'তিনি হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব।' উমাইয়া ইবনে খালাফ বললো-'এ লোকটিই আমাদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে!'

এ সময় বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়াকে দেখে ফেললেন। এই উমাইয়া একদিন বেলালকে মক্কায় নিষ্ঠুরের মতো নির্যাতন করেছে। দিনের পর দিন তাঁকে উত্তপ্ত বালুতে ফেলে রেখেছে। বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়াকে দেখেই বলে উঠলেন-'এই তো কাফেরদের সর্দার উমাইয়া ইবনে খালাফ! হয়তো আমি বাঁচবো অথবা সে বাঁচবে।' এরপর উচ্চকণ্ঠে বললেন- 'ওহে আনসাররা, এই দেখো, কাফেরদের সর্দার উমাইয়া ইবনে খালাফ, এবার হয়তো আমি থাকবো অথবা সে থাকবে।'

সাহাবীরা উমাইয়াকে ঘিরে ফেললেন। আবদুর রহমান তাকে বাঁচানোর যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাহাবীরা মিলে অত্যাচারী উমাইয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শেষ করে দিলেন। অত্যাচারী কাফেরের জন্য পৃথিবীর সকল দরজা আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দয়া-মায়ার পৃথিবী তাদের জন্য সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে।

মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাই আবু আযীয বিন উমাইরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু আযীয মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একজন আনসারী সাহাবী তাকে বাঁধছিলেন। মুসআব তাঁর ভাইকে দেখিয়ে সে সাহাবীকে বললেন-'এই লোকটির মাধ্যমে হাত মজবুত করো। তার মা অনেক সম্পদশালী। তিনি সম্ভবত তোমাকে ভালো মুক্তিপণ দেবেন!'

আবু আযীয তাঁর ভাই মুসআবকে বললো- 'ভাই, আমার ব্যাপারে কি তোমার এটাই বক্তব্য?' মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- 'হ্যাঁ, তুমি নও, বরং এই আনসারী হচ্ছেন আমার ভাই।'

মুসলমানদের এই অভূতপূর্ব বিজয় এবং কাফেরদের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হলো বদর যুদ্ধ। চৌদ্দজন মুসলমান শহীদ হয়েছেন। এদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির আর আটজন আনসার।

কিন্তু কাফেরদের সত্তরজন নিহত এবং সত্তরজন বন্দি হয়েছে। তাদের প্রায় সবাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গোত্রের সর্দার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত কাফেরদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন- 'তোমরা তো সবাই ছিলে নেতৃস্থানীয় লোক। তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করোনি, অথচ অনেকেই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তোমরা আমাকে নিঃসঙ্গ সহায়হীন অবস্থায় ফেলে রেখেছিলে, অথচ অনেকে আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা আমাকে বের করে দিয়েছিলে, অথচ অনেকে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মৃতদেহ টেনে বদরের একটি কূপের ভেতর ছুড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ৬

উতবা বিন রবীআর লাশ কূপের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবার পুত্র হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখের দিকে তাকালেন। লক্ষ করলেন, তিনি বিমর্ষ। তাঁকে কেমন যেন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'হুযাইফা, পিতার জন্য কি কষ্ট হচ্ছে?' তিনি বললেন-'জি না, হে আল্লাহর রাসূল। আমার মনের মধ্যে কোনো চিন্তা নেই, তবে এটুকু কথা যে, আমি ধারণা করেছিলাম আমার পিতার মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে। এ কারণে আশা করেছিলাম তাঁর বিবেক-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কারণে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু এখন তাঁর পরিণাম দেখে, কুফরির উপর তার জীবন শেষে হতে দেখে খুব খারাপ লাগছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

কুরাইশদের বড় বড় সর্দারের লাশ বদরের নোংরা কূপে নিক্ষেপ করা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে রাত কাটালেন। তিন দিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারির পিঠে আসন সাঁটা হলো। তিনি পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন, সাহাবীরা তাঁকে অনুসরণ করলেন। হঠাৎ কূপের পাশে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

এরপর বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন-'হে উতবা! হে শাইবা। হে আবু জাহল! ... তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে, তবে সেটা কি তোমাদের জন্য ভালো হতো না? আল্লাহ আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, আমরা তার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছো?'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি দেখি প্রাণহীন দেহের সাথে কথা বলছেন!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যা কিছু বলছি, তোমরা ওদের চেয়ে বেশি শুনতে পাচ্ছো না। কিন্তু ওরা জবাব দিতে পারে না।'৭

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মদীনার পথে রওনা হওয়ার আগেই গনিমতের মাল প্রসঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। কারণ যুদ্ধ শেষে একদল কাফেরদের ধাওয়া ও গ্রেফতার করেছেন, একদল গনিমতের মাল জমা করেছেন এবং তৃতীয় দল

নিরাপত্তার জন্য সারাক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘেরাও করে রেখেছেন। তারা ভেবেছেন, শত্রুরা ধোঁকা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে পারে; কিন্তু গনিমতের মাল সংগ্রাহকরা বলাবলি করতে লাগলেন যে- 'আমি এই পরিমাণ সংগ্রহ করেছি, এগুলো সব আমার, আমি এর ভাগ অন্য কাউকে দেবো না।' শত্রুদের ধাওয়াকারীরা বললেন-'আমরা এই সব মালামাল থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছি; কাজেই এ সব আমাদের।' যে সকল সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তারা বললেন- 'আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে, শত্রুরা হয়তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনিরাপদ মনে করে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে। এ কারণে আমরা তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলাম!'

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমের আয়াত নাযিল করে মীমাংসা করে দিয়ে বলেন-'আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বলে দিন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।' (সূরা আনফাল: ১)।

বন্দি ও গনিমতের মাল আবদুল্লাহ ইবনে কাবের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

মদীনার পথে চলতে চলতে সাফরা প্রান্তর অতিক্রমের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাযিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় একটি টিলায় অবস্থান করেন। সেখানেই আল্লাহর রাসূল অহীর নির্দেশমতো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকি সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেন।৮

সাফরা প্রান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাযার ইবনে হারিসকে হত্যার নির্দেশ দেন। বদরের যুদ্ধে এই লোকটি কুরাইশদের পতাকা বহন করেছে এবং সে অপরাধীদের অন্যতম। সে ইসলামের শত্রুতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো।

এরপর তাঁরা ইরকে যুবয়াতে পৌঁছেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উকবা ইবনে আবু মুঈতকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে ইসলামের শত্রুতায় অগ্রণী

ছিলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো। আল্লাহর রাসূল নামায আদায়রত অবস্থায় তাঁর কাঁধে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিতো এবং গলায় চাদর জড়িয়ে আল্লাহর রাসূলকে হত্যার চেষ্টা করতো। যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই দুর্বৃত্ত ছিলো অতি জঘন্য যুদ্ধাপরাধী।

মুসলমানদের বিজয় পরিপূর্ণ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের তাড়াতাড়ি সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দূত পাঠান। মদীনার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির দুটি এলাকায় খবর দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও যায়দ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে প্রেরণ করা হয়।

এর আগে ইহুদি ও মুনাফিকরা পরাজয়ের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মদীনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে রেখেছিলো। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার খবর পর্যন্ত তারা প্রচার করেছে। তাই যায়দ ইবনে হারিসাকে রাসূলের কাসওয়া নামক উটনির পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে দেখে একজন মুনাফিক বলে ওঠে- 'সত্যি সত্যি মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। ওই দেখো, তার উটনি। আমরা এ উটনি চিনি। ওই দেখো, যায়দ ইবনে হারিসা। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না!'

উভয় দূত পৌঁছার পর মুসলমানরা তাদের ঘিরে ধরে বিস্তারিত বিবরণ শুনতে লাগলেন। সব শোনার পর বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুসলমানরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। যে সকল মুসলমানের বদর প্রান্তরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বদরের পথে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওহা নামক স্থানে পৌঁছলে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে আসা মুসলমানদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো।

তারা আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের মোবারকবাদ জানালেন।

উসাইদ বিন হুযাইর রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আপনাকে কামিয়াবি দান করেছেন এবং আপনার চক্ষু শীতল করেছেন। আল্লাহর শপথ, আমি জানতাম না যে, শত্রুদের সাথে আপনার মোকাবেলা হবে; আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি একটি কাফেলার সন্ধানে বেরিয়েছেন। যদি জানতাম যে, শত্রুদের সাথে মোকাবেলা হবে, তবে কিছুতেই পেছনে থাকতাম না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'তুমি সত্য বলেছো।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো বিয়োগব্যথা। তাঁর কন্যা রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দাফন করে যখন মুসলমানরা কবরের উপরের মাটি সমান করে দিচ্ছিলেন, সে সময় তাদের কাছে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের খবর পৌঁছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসার পর আদরের কন্যার মুখটি আর দেখতে পেলেন না। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী সাহাবী বলে আখ্যায়িত করেন; কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

এক দিন পর যুদ্ধবন্দিরা এসে পৌঁছে মদীনায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। মদীনায় খেজুরের চেয়ে রুটির মূল্য ও গুরুত্ব ছিলো অধিক। রাসূলের উপদেশের ফলে সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা খেজুর খেয়ে কয়েদিদের রুটি খেতে দিতে শুরু করেন। ৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদের শিরশ্ছেদ করাই যুক্তিসঙ্গত!' এই মত পছন্দ করলেন না। 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, এ সকল বন্দি আপনারই স্বগোত্রীয়; আমার মতে, ওদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে এদের ছেড়ে

দেওয়া হোক। হতে পারে, আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াত দেবেন এবং ওরাই একসময় কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে!'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রিয়জনকে হত্যা করবে। আপনি আমার আত্মীয়কে আমার হাতে তুলে দিন, আমি তার শিরশ্ছেদ করবো। একইভাবে আকিল ইবনে আবু তালিবকে আলীর হাতে তুলে দিন, আলী তার শিরশ্ছেদ করবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের কথা শোনার পর আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করলে কয়েদিদের কাছ থেকে ফিদয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০

পরদিন খুব সকালে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি এবং আবু বকর কাঁদছেন। উমর বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, আপনারা কেন কাঁদছেন, আমাকে বলুন। যদি কান্নার কারণ ঘটে থাকে, তবে আমিও কাঁদবো। যদি কারণ না ঘটে, তবে আপনাদের কান্নার কারণে কাঁদবো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'ফিদয়া দেওয়ার শর্ত গ্রহণ করার কারণে তোমার সঙ্গীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার জন্য কাঁদছি।' এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী একটি গাছের প্রতি ইশারা করে বললেন- 'আমার কাছে ওদের আযাব এই গাছের চেয়ে আরো কাছ

থেকে দেখানো হয়েছে।'

আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে সাহাবীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। প্রবীণ যে সব সাহাবী মুক্তিপণ নেওয়ার কথা বলেছিলেন, তারা কেউ ভেবেছিলেন, মুক্তিপণের অর্থ পরবর্তী সময়ে দীনের কাজে লাগতে পারে, হয়তো তাদের মধ্যে কেউ জাগতিক সম্পদ অর্জনের কথা ভেবেছেন; যদিও এই পথে সম্পদ অর্জন হালাল, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বতের জন্য আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের আয়াত নাযিল করে বলেন-'যদি পূর্ব অনুমতি না থাকতো, তবে

তোমরা যা গ্রহণ করেছো, তার জন্য আযাব নাযিল হতো। অতএব তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছো, তা গনিমতের সম্পদ হিসেবে খেতে থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।'

(সূরা আনফাল: ৭৬-৬৮)

এই আয়াতে যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে ফিদয়া নেওয়ার অনুমতি থাকায় বন্দিদের ব্যাপারে ফিদয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়ায় সাহাবায়ে কেরামকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। ভর্ৎসনা করার কারণ হলো, তারা এমন সব কাফের থেকে ফিদয়া বা মুক্তিপণ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যারা শুধু যুদ্ধবন্দি ছিলো না, বরং গুরুতর অপরাধীও ছিলো। এদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিলো মৃত্যুদণ্ড অথবা দাসত্ব।

মুশরিকদের কাছ থেকে নেওয়া ফিদয়ার পরিমাণ ছিলো এক থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত। মক্কাবাসীরা লেখাপড়া জানতো। পক্ষান্তরে মদীনাবাসীরা লেখাপড়ার সাথে তেমন পরিচিত ছিলো না। এ কারণে এরূপ সিদ্ধান্তও রাখা হয়েছিলো যে, যাদের মুক্তিপণ প্রদানের সামর্থ্য নেই, তারা মদীনায় দশটি করে শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে। শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে নিলে শিক্ষক কয়েদিদের জন্য সেটাই হবে মুক্তিপণ।

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে সুহাইল ইবনে আমরও ছিলো। সে ছিলো একজন খ্যাতিমান বক্তা। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল, সুহাইল ইবনে আমরের সামনের দুটি দাঁত ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করুন, এতে তার কথা মুখে জড়িয়ে যাবে আর সে সুবক্তা হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে সুবিধা করতে পারবে না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা মানুষের অঙ্গহানি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন বন্দিকে বিশেষ দয়া করায় তাদের কাছ থেকে ফিদয়া গ্রহণ না করে

এমনিতেই মুক্তি দেওয়া হলো। এরা ছিলো মুত্তালিব ইবনে হানতাব, সাঈফী ইবনে আবু রিফায়া ও আবু উযযা জুমাহী।

সাদ ইবনে নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উমরা পালনের জন্য বের হয়েছিলেন।

এ সময় আবু সুফিয়ান তাকে গ্রেফতার করে। আবু সুফিয়ানের পুত্র আমর যুদ্ধবন্দি ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরকে আবু সুফিয়ানের হাতে ন্যস্ত করার বিনিময়ে সাদকে মুক্ত করেন।

এদিকে যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে রাসূলের বড় কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী আবুল আসও ছিলেন। মক্কা থেকে যায়নাব পিতার কাছে আবুল আসের মুক্তিপণ পাঠান। মুক্তিপণের মধ্যে একটি হার ছিলো। হারটি দেখামাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

এ যে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর হার! কত বছর হয় খাদীজা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন! যাওয়ার আগে ইসলামের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। সুখ-দুঃখের কত স্মৃতি তাঁর সাথে। মহীয়সী সেই নারী তাঁর সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। আজ ইসলামের প্রথম বিজয়, অথচ তিনি নেই। তবে না থেকেও তিনি যেন আছেন, আলো-ছায়া হয়ে!! াগাংতীরি ও চিলকে ইন্ড

এই হারটি তিনি কন্যা যায়নাবকে দিয়েছিলেন কন্যাকে আবুল আসের ঘরে পাঠানোর সময়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে হার দেখে নিজের কষ্ট সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি আবুল আসকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের মতামত চাইলেন। সাহাবীরা তাঁর প্রস্তাব খুশিমনে সশ্রদ্ধভাবে অনুমোদন করলে নবীজি হারটি ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর জামাতা আবুল আসকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, মক্কায় পৌঁছেই আবুল আস যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবেন।

যায়নাবকে নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ ইবনে হারিসা এবং অন্য একজন আনসারী সাহাবীকে মক্কায় প্রেরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল নাযিল করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি আলোকপাত করেন। এই সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা অনেকের মধ্যে ছিলো, যা যুদ্ধ শেষে কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন এজন্য যে, মুসলমানরা ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন এবং তারা ঈমানের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভে সক্ষম হবেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধে গায়েবি সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন, যেন মুসলমানরা নিজেদের বীরত্ব ও বাহাদুরির ধোঁকায় না পড়েন। কেননা এর ফলে তাদের মনে অহংকার দেখা দেবে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা চান যে, মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরতা এবং রাসূলের প্রতি আনুগত্যের গুণই যেন দেখা দেয়।জাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে এ ভয়াবহ ও রক্তাক্ত অভিযানের পথে পা রেখেছিলেন, সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে যে অপরিহার্য চারিত্রিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের থাকা দরকার, সে ব্যাপারেও আলোচনা করেন। মুশরিক, মুনাফিক, ইহুদি ও যুদ্ধবন্দিদের উদ্দেশ্যে এমন উপদেশ দেন, যাতে তারা সত্যের সামনে মাথা নত করে সত্যের অনুসারীতে পরিণত হয়।

এরপর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা ব্যাখ্যা করা হয়। যুদ্ধ ও সন্ধির বিধানও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই ব্যাখ্যা ও নীতিমালা এ কারণেই দেওয়া হয়েছে, যাতে মুসলমানরা ইসলামপূর্ব যুদ্ধ এবং ইসলাম-পরবর্তী যুদ্ধের পার্থক্য করতে পারেন। এছাড়া নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যেন তারা উচ্চতর মর্যাদা লাভে সক্ষম হন। বিশ্বাসীরা যেন এর মাধ্যমে জানতে পারে যে, ইসলাম শুধু একটি আদর্শমাত্র নয়, বরং ইসলাম যে নীতিমালা

ও বিধিবিধানের দাওয়াত দেয়, সে অনুযায়ী ইসলামের অনুসারীদের বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে।

এরপর ইসলামি রাষ্ট্রের নীতিমালা সম্পর্কে কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয় হিজরির রমযান মাসে বদর যুদ্ধের সময় রোযা ও সদকাতুল ফিতর ফরয করা হয়। যাকাতের পরিমাণও এ সময়ে নির্ধারণ করা হয়।

মুহাজিরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিলেন খুবই গরিব, যাঁরা মসজিদে নববীর পাশে একটি নির্ধারিত স্থানে থাকতেন, যাঁদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হয়। তাঁদের এবং আরো কিছু সাহাবীর রুটি-রুজির সমস্যা ছিলো প্রকট। ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিভিন্ন স্থানে ছুটোছুটি করা তাঁদের জন্য ছিলো কষ্টকর। সদকায়ে ফিতর এবং যাকাত সম্পর্কিত বিধান তাদেরকে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের আয়াতে তাঁর নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলেন-'স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক। পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে; তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদের আকস্মিকভাবে ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।' (সূরা আনফাল: ২৬০

মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টি আরো বেশি পরিমাণে লাভ করতে আগ্রহী ছিলেন তাদের মাথা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ছিলো অবনত। বদর যুদ্ধে বিজয়ের বছরই দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে প্রথমবারের মতো ঈদ উদযাপন করেন তারা। মুসলমানদের মাথায় বিজয় ও সম্মানের মুকুট রাখার পর আল্লা রব্বুল আলামীন তাদেরকে উৎসব উদযাপনের সুযোগ দেন। ঈদ মুসলমানদের জীবনে আনন্দ ও সৌভাগ্য বয়ে আনে।

ঈদের নামায আদায়ের সেই দৃশ্য ছিলো খুবই মনোমুগ্ধকর। সে সময় মুসলমানদের মন আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত এবং সাহায্যের কারণে ছিলো পরিপূর্ণ। মুসলমানদের কণ্ঠস্বরে আল্লাহর হামদ, তাকবীর, তাসবীহ ও তাওহীদের ঘোষণায় মদীনার অলিগলি মুখরিত হয়ে ওঠে। মদীনার বাগান ও পথে-প্রান্তরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। একরাশ স্বপ্ন চোখে নিয়ে কাঁটাঝোপে গোলাপের মতো পৃথিবীর বুকে সুশোভিত হয়ে হেসে ওঠে মদীনাতুন্নবী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের মোট যুদ্ধ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবনে মোট যুদ্ধকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

গাযওয়া : যে সকল যুদ্ধে রাসূল ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেছেন।

মোট গাযওয়া ছিল প্রায় ২৭টি।

সারিয়া : যে সকল অভিযানে রাসূল ﷺ নিজে অংশ নেননি, কিন্তু সাহাবিদের পাঠিয়েছিলেন।

মোট সারিয়া ছিল প্রায় ৪৭টি।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো হলোঃ

১)বদর যুদ্ধ

২)উহুদ যুদ্ধ

৩)খন্দকের যুদ্ধ

৪)মক্কা বিজয়

৫)হুনাইনের যুদ্ধ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোট ৭ জন সন্তান ছিলেন।

পুত্র সন্তান

১। কাসিম (রা.)

২। আবদুল্লাহ (রা.)

৩। ইবরাহিম (রা.)

কন্যা সন্তান

১। জয়নব (রা.)

২। রুকাইয়া (রা.)

৩। উম্মে কুলসুম (রা.)

৪। ফাতিমা (রা.)

সব সন্তান খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু ইব্রাহিম ইবনে মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন মারিয়া আল কীবতিয়া (রা.)-এর গর্ভে।

বিদায় হজ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজে রওনা হওয়ার তারিখ ঘোষণা করেছেন। তাঁর ঘোষণা শুনে মুসলমানরা দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে মক্কায় আগমন করতে শুরু করলেন।

যিলকদ মাসের এক চমৎকার দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় তেল দিলেন, ঘন কালো চুল আঁচড়ালেন, চাদর গায়ে জড়ালেন, কুরবানির পশুকে সজ্জিত করলেন এবং যোহরের পর হাজার হাজার সাহাবীকে নিয়ে মক্কার পথে রওনা হলেন।১ তাঁর সাথে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীগণ এবং কলিজার টুকরো কন্যা ফাতেমাও ছিলেন। অন্য কন্যারা আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

আসরের আগেই তিনি যুল হুলাইফা পৌঁছে আসরের দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু স্থাপন করে সেখানেই রাত কাটালেন। আর সকালে সাহাবীদের বললেন- 'রাতে আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক এসে বলেছেন-হে নবী, এই পবিত্র প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন যে, হজের মধ্যে উমরা রয়েছে।'২

এরপর যোহরের নামাযের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামের জন্য গোসল করলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর কোমল হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহে যারীরা ও মেশকের খুশবু লাগালেন। খুশবুর চমক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাড়িতে দেখা যাচ্ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই খুশবু ধৌত করলেন না; যেমন ছিলো তেমনই রেখে দিলেন।

এরপর তিনি চাদর পরিধান করে যোহরের দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। পরে নামাযের স্থানে বসেই হজ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধে 'তালবিয়া' পাঠ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পরে উটনিতে আরোহণ করে দুবার 'লাব্বাইক' বললেন। উটনিতে চড়ে খোলা ময়দানে গিয়ে সেখানেও 'লাব্বাইক ধ্বনি' দিলেন।

মোবারক কাফেলা এগিয়ে চললো। একসময় মক্কার কাছে পৌঁছে যু তুওয়া নামক জায়গায় অবস্থান করলেন এবং ফজরের নামায আদায়ের পর গোসল করলেন। এরপর মক্কায় প্রবেশ করলেন। মসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে কাবাঘর তাওয়াফ করলেন। এরপর সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় সায়ী করলেন, কিন্তু ইহরাম খুলেননি। কারণ তিনি হজ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাথে কুরবানির পশুও এনেছিলেন। তাওয়াফ ও সায়ী শেষে তিনি হাজ্জুনে অবস্থান করেন এবং হজের তাওয়াফ ব্যতীত অন্য কোনো তাওয়াফ থেকে বিরত থাকেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আসা যে সকল সাহাবী কুরবানির পশু সঙ্গে আনেননি, তাঁদের তিনি আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন নিজেদের ইহরাম উমরায় পরিবর্তিত করে নেন এবং কাবাঘর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী শেষ করে পুরোপুরি হালাল হয়ে যান। কিন্তু যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হালাল হননি, এ কারণে সাহাবীরা দ্বিধা করতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'আমি যা পরে জেনেছি,

সেটা যদি আগে জানতাম, তবে আমি কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না। যদি আমার সাথে কুরবানির পশু না থাকতো, তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শোনার পর যাঁদের কাছে কুরবানির পশু ছিলো না, তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন।

যিলহজ মাসের আট তারিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় গেলেন। সেখানে নয় তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করলেন। যোহর, আসর, মাগরিব,

এশা ও ফজর-এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সেখানে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সূর্যোদয়ের পর আরাফার ময়দানে এসে দেখলেন নামিরা প্রান্তরে তাঁবু প্রস্তুত রয়েছে। তিনি সেখানে অবস্থান করলেন।

সূর্য ঢলে পড়লে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে উটনির পিঠে আসন লাগানো হলো। তিনি প্রান্তরের মাঝামাঝি স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চারদিকে তখন জনসমুদ্র। চারদিকে এক লাখ চব্বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ তাঁর কথা শোনার অপেক্ষায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তাঁর বাণীসমূহ রবীআ বিন উমাইয়া উচ্চকণ্ঠে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে থাকেন। ৩

ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'হে লোকসকল, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো; আমি জানি না, এবারের পর তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর মিলিত হতে পারবো কি না!

নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও ধনসম্পদ আজকের দিন, এই মাস এবং এ শহরের মতোই মর্যাদাপূর্ণ । মনে রেখো, জাহেলিয়াতের সবকিছু আমার পদতলে কবর দেওয়া হয়েছে। জাহেলিয়াতের খুন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ম্যাকার যে প্রথম রক্ত আমি শেষ করেছি, তা হচ্ছে, রবীআ বিন হারিসের পুত্রের রক্ত। সে বনু সাদ গোত্রে দুধ পান করছিলো, সে সময় বনু হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলিয়াতের সমস্ত সুদ বাতিল। আমি প্রথমেই বাতিল করছি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সকল প্রকার সুদ বাতিল।

নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো; কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানতের সাথে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ করো না। যদি তারা এরূপ করে, তবে তোমরা তাদের শাস্তি

দিতে পারো, কিন্তু লঘু শাস্তি। আর তোমাদের উপর তাদের রয়েছে ন্যায়ভাবে খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার অধিকার।

তোমাদের কাছে আমি এমন একটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সেটি হলো আল্লাহর কিতাব ।৪

হে লোকসকল, জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আমার পরে কোনো নবী নেই।

তোমাদের পরে আর কোনো উম্মত নেই। কাজেই নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, সানন্দচিত্তে নিজের ধনসম্পদের যাকাত দেবে, আপন রবের ঘরে হজ করবে, এবং শাসকদের আনুগত্য করবে। যদি এরূপ করো, তবে তোমাদের রবের নিকট জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কী বলবে?' সাহাবীরা বললেন-'আমরা সাক্ষ্য দেবো, আপনি আপনার রেসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনি আমাদের নসিহত করেছেন।'

এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাত আঙুল আকাশের দিকে তুলে এরপর লোকদের দিকে ঝুঁকিয়ে তিনবার বললেন-'হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো।'৫

ভাষণ শেষ করার পর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন-'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জীবনবিধানরূপে দীন ইসলামকে মনোনীত করলাম।'

(সূরা মায়িদা: ৩)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহ এই আয়াত শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো-'তুমি কাঁদছো কেন?' তিনি বললেন-'কাঁদছি এজন্য যে, পূর্ণতার পর এখন অপূর্ণতা ব্যতীত আর তো কিছু বাকি নেই।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 'তুমি সত্য বলেছো। '৬

ভাষণের পর বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহ আযান ও ইকামত দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। এরপর বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহ আবার ইকামত দিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। উভয় নামাযের মাঝামাঝি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোনো নামায আদায় করেননি।

এরপর সওয়ারিতে আরোহণ করে তাঁর অবস্থানস্থলে গমন করলেন। সেখানে তিনি উটনির পিঠেই অপেক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পর সূর্যাস্ত হলো।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহকে পেছনে বসালেন এবং সেখান থেকে রওনা হয়ে মুযদালিফা গমন করলেন। সেখানে মাগরিব ও ইশার নামায এক আযানে এবং দুই ইকামতে আদায় করলেন। মাঝখানে কোনো নফল নামায আদায় করলেন না।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। ফজরের নামাযের সময় হওয়ার পর তিনি উঠলেন এবং আযান ও ইকামতের সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর উটনিতে সওয়ার হয়ে মাশআরুল হারামে উপস্থিত হয়ে কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। আল্লাহর নামে তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তাওহীদের কালিমা উচ্চারণ করলেন।

চারদিক ভালোভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। এরপর সূর্য ওঠার আগে আগেই মিনার উদ্দেশে রওনা হলেন। এবার ফযল বিন আব্বাসকে নিজের পেছনে বসালেন। আবরাহার সৈন্যদের উপর গযব আসার জায়গায় পৌঁছে সওয়ারিকে দ্রুত ছোটালেন। অতঃপর জামারায়ে আকাবায় পৌঁছলেন। পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে

সেখানে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিবার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি দিলেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাইয়ের স্থানে গমন করে তাঁর পবিত্র হাতে তেষট্টিটা উট জবাই করলেন। এরপর বাকি সাঁইত্রিশটা উট আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জবাই করতে বললেন। একশত উট কুরবানি করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে প্রত্যেক উট থেকে এক টুকরো করে গোশত নিয়ে একটি হাঁড়িতে রান্না করা হলো। আহারের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারিতে আরোহণ করে হারামে পৌঁছলেন। বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করলেন। এই তাওয়াফকে বলা হয় 'তাওয়াফে ইফাযা'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর যমযম কূপের কাছে গিয়ে দেখলেন, আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকেরা হাজীদের যমযমের পানি পান করাচ্ছেন। তিনি বললেন-'হে বনু আবদুল মুত্তালিব, পানি উত্তোলন করতে থাকো। যদি এ আশঙ্কা না করতাম যে, পানি উত্তোলনের কাজে অন্য লোকেরা তোমাদের পেছনে ঠেলে দেবে, তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি উত্তোলন করতাম।'

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব বংশের সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক বালতি পানি দিলে তিনি প্রয়োজনমতো পানি পান করলেন।৭

যিলহজ মাসের দশ তারিখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের সময় সাহাবীদের উদ্দেশে আরেকটি ভাষণ দিলেন। খচ্চরের পিঠে আরোহী ছিলেন তিনি। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য সমবেত সাহাবীদের শোনাতে লাগলেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ বসে ছিলেন, কেউ দাঁড়িয়ে ছিলেন।৮

এই ভাষণেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের দিনের কিছু বক্তব্য পুনরায় উল্লেখ করেন। এতে তিনি আরো বলেন-'আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কালের আবর্তন চলছে। বারো মাসে এক বছর। এর

মধ্যে চার মাস হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ মাস। তিনটি মাস পর্যায়ক্রমে আসে-যিলকদ, যিলহজ ও মুহাররম। অপরটি রজব।'

তিনি বললেন-'এটি কোন মাস?' সাহাবীরা বললেন-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জনেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। সকলে ভাবলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো এই মাসের অন্য কোনো নাম রাখবেন। কিন্তু তিনি বললেন-'এটি কি যিলহজ মাস নয়?' সাহাবীরা বললেন-'জি।'

তিনি বললেন-'এটি কোন শহর?' সাহাবীরা বললেন-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। সাহাবীরা ভাবলেন, তিনি এই শহরের অন্য কোনো নাম রাখবেন। কিন্তু তিনি বললেন-'এটি কি মক্কা শহর নয়?' সাহাবীরা বললেন-'জি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'এই দিনের পরিচয় কী?' সাহাবীরা বললেন-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। সবাই ভাবলেন, তিনি এই দিনের অন্য নাম রাখবেন। কিন্তু তিনি বললেন-'এই দিন কি কুরবানির দিন নয়?' সাহাবীরা বললেন-'জি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত-আবরু পরস্পরের জন্য ঠিক তেমনি হারাম, যেমন হারাম তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং আজকের এই দিন। শীঘ্রই তোমরা রবের সাথে মিলিত হবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই লক্ষ রেখো, আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না। এমন যেন না হয়, তোমরা একে অপরের মাথা কাটতে শুরু করে দিলে। আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি?'

সাহাবীরা বললেন-'জি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো। যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত রয়েছে, তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে। অনেক সময় অনুপস্থিত ব্যক্তি শ্রোতার চেয়ে আরো সুন্দর করে বুঝতে পারে!'৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইয়ামে তাশরীক-এগারো, বারো ও তেরো যিলহজ মিনায় অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি হজের আমলসমূহও পালন করেন। সেই সাথে জনসাধারণকে শরীয়তের হুকুম-আহকামও শিক্ষা দেন। আল্লাহর যিকির ও মিল্লাতে ইবরাহীমের সুন্নাতসমূহ কায়েম করেন। শিরকের নিদর্শনসমূহ নির্মূল করেন। আইয়ামে তাশরীকের একদিনে একটি ভাষণ দেন।

যিলহজ মাসের তেরো তারিখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনা থেকে যাত্রা করে আবতাহ উপত্যকায় দিনের কিছু অংশ এবং রাতে অবস্থান করেন। সকালে উঠে বাইতুল্লাহ পৌঁছে বিদায়ি তাওয়াফ করে মদীনার পথে পা বাড়ান।

ইন্তেকাল

উসামা বিন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়সে তরুণ, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাঁকে মুসলিম বাহিনীর আমির বানিয়েছেন। সাহাবীরা এ কারণে অভিযানে অংশ নিতে দ্বিধা করছেন।

রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে উসামার পিতা মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার যায়দ ইবনে হারিসা শহীদ হয়েছিলেন। যে যুদ্ধ রোমানরা শুরু করেছিলো, সে যুদ্ধের সমাপ্তির প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া রোমান শাসকরা ইসলাম ও মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে যে সব এলাকা, সে সব এলাকায় কারো ইসলাম গ্রহণ করা ছিলো বিপজ্জনক।

রোমান সাম্রাজ্যের শাসকদের এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাদশ হিজরির সফর মাসে বিশাল একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। উসামা বিন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেই বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করে আদেশ দেন যে, বালকা ও দারুমের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মুসলিম বাহিনীর শক্তি প্রদর্শন করে আসতে। রোমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহের মনে সাহস সঞ্চার করে আসতে।১

কিন্তু সাধারণ সাহাবীরা বড় বড় প্রবীণ সাহাবীদের আমির হিসেবে একজন তরুণকে সেনাপতি হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা দেখে বললেন- 'তোমরা যদি উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলো, তবে তো তোমরা তার পিতাকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলেছিলে। আল্লাহর শপথ, যায়দ সেনাপতি হওয়ার যোগ্য ছিলো, সে ছিলো আমার প্রিয়দের অন্যতম। উসামাও যায়দের পর আমার প্রিয়দের অন্যতম।'২ সাহাবায়ে কেরাম এ কথা শুনে সাথে সাথে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে সমবেত হয়ে তাঁর সেনাবাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন।

বুধবার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ। বৃহস্পতিবার অসুস্থ অবস্থায় উসামার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন-'আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করো!
বিশাল এই বাহিনী যখন রওনা হয়ে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে জুরুফ নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার সংবাদ তাঁদের কাছে পৌঁছলো। আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় তাঁরা সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। ৩

দশম হিজরির রমযান মাসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ দিন এতেকাফ করেছিলেন; অথচ সাধারণত তিনি দশ দিন এতেকাফ করেন। শেষ হজ থেকে ফিরেই তিনি তাসবীহ, তাহলীল ও বেশি বেশি নামাযে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

একাদশ হিজরির সফর মাসে তিনি উহুদ প্রান্তরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁদের জন্য এমনভাবে দুআ করেছিলেন, যেভাবে কোনো জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে শেষ বিদায় জানিয়ে থাকে।

অতঃপর ফিরে এসে মিম্বরে বসে বলেছিলেন- 'আমি তোমাদের কর্মতৎপরতার আমির এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ, এখন আমি আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি। আমাকে সমগ্র বিশ্বজাহান এবং এর ধনভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি এ আশঙ্কা করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে; কিন্তু আমার ভয় হয়, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে!'৪

এরপর একদিন মধ্যরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যান এবং সেখানে মৃতদের জন্য দুআ করেন। সে দুআয় তিনি বলেন-'হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে, তারচেয়ে তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো, তা তোমাদের জন্য শুভ হোক। ফেতনা একের পর এক আঁধার রাতের মতো ধেয়ে আসছে। আগেরটির চেয়ে পরেরটি আরো মন্দ ও ভয়াবহ!' তিনি

এ সময় কবরবাসীদের সুখবর প্রদান করেন যে-'অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।'

জান্নাতুল বাকী থেকে ফেরার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথাব্যথা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তাঁর শরীর গরম হয়ে ওঠে। জ্বর এত বেড়ে যায় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপর দিয়েও তাপ অনুভূত হতে থাকে।

ক্রমেই অসুস্থতা বাড়তে থাকে। এ সময় তিনি সহধর্মিণীদের কাছে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন- 'আগামীকাল আমি কোথায় থাকবো?' তাঁর প্রিয়তমারা তাঁর মনের ছটফটানি বুঝতে পারলেন। তাঁরা অনুমতি দিয়ে বললেন- 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন, সেখানেই থাকবেন।’
ফযল বিন আব্বাস ও আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহ তাঁর ভর কাঁধে নিয়ে তাঁকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নিয়ে এলেন। সময় গড়াতে থাকে, কিন্তু তাঁর অসুখ কমার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু মানহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শেখা দুআসমূহ পাঠ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহে ফুঁ দেন এবং বরকতের আশায় রাসূলের পবিত্র হাত তাঁর দেহে ফেরাতে থাকেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশাকে বললেন-'হে আয়েশা, খায়বারে আমি যে বিষমিশ্রিত খাবার মুখে দিয়েছিলাম, তার কষ্ট সব সময় অনুভব করেছি। এখন মনে হচ্ছে, সেই বিষের প্রভাব আমার শিরা কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।'৫

ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলো। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরলে বললেন- 'বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি আমার উপর ঢালো, আমি লোকদের কাছে গিয়ে কয়েকটি অসিয়ত করবো।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি তশতরিতে বসিয়ে তাঁর উপর পানি ঢালা শুরু হলো। একপর্যায়ে তিনি বললেন- 'যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রয়োজন নেই।'

ঘরের সাথেই মসজিদ। কিছুটা সুস্থ বোধ করলে তিনি মসজিদে গেলেন। মাথায় পট্টি বাঁধা ছিলো। মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন-'হে লোকসকল, আরো কাছে এসে বসো।' সাহাবীরা যাঁরা সামান্য দূরে ছিলেন, তাঁরা আরো কাছে চলে এলেন। তিনি বললেন- 'ইহুদি-খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর লানত; কেননা তারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।'৬

তিনি আরো বললেন-'তোমরা আমার কবরকে পূজা করার উদ্দেশ্যে মূর্তিতে পরিণত কোরো না।'৭ এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদলার জন্য নিজেকে পেশ করে বললেন- 'আমি যদি কারো পিঠে চাবুক দ্বারা আঘাত করে থাকি, তবে এই হচ্ছে আমার পিঠ, সে যেন বদলা নিয়ে নেয়। যদি কাউকে অসম্মান করে থাকি, তবে সে যেন আমার কাছ থেকে বদলা গ্রহণ করে।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে অসিয়ত করে বললেন-'আমি তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে অসিয়ত করছি; কেননা তারা আমার আত্মা ও আস্থাভাজন। তারা নিজেদের জিম্মাদারি পূর্ণ করেছে, কিন্তু তাদের অধিকারসমূহ বাকি রয়ে গেছে। কাজেই তাদের নেককার লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং বদকারদের ক্ষমা করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'একজন বান্দাকে আল্লাহ তাআলা এই এখতিয়ার দিয়েছেন যে, সে ইচ্ছা করলে দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য গ্রহণ করতে পারবে, অথবা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা বেছে নিতে পারবে।

আল্লাহর সেই বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা বেছে নিয়েছে।'

এ কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ কাঁদতে শুরু করলেন; কাঁদতে কাঁদতে বললেন-'আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক।' লোকজন বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো!

কেউ বললো-'এই বৃদ্ধকে দেখো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বললেন, আর তিনি কী বলছেন!' লোকজন বুঝতে পারেনি, আল্লাহর রাসূল কী বলেছেন! নাহলে তারাও আবু বকরের মতো কাঁদতে শুরু করতো!৯

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'বন্ধুত্ব এবং অর্থ-

সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি এহসান রয়েছে আবু বকরের। যদি আমি আমার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাউকে খলিল (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তাঁর সাথে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান। মসজিদ অভিমুখে যতগুলো দরজা আছে, সব বন্ধ

থাকবে, কেবল আবু বকরের দরজা খোলা থাকবে।' ১০

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরে গেলেন।

ওফাতের চার দিন আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুবই কষ্ট হতে লাগলো। সাহাবীরা মুখ মলিন করে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময় তিনি বললেন- 'আমি তোমাদের কিছু লিখে দিচ্ছি, এরপর তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না।' ঘরে বেশ কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমরও ছিলেন। তিনি বললেন- 'আপনি অসুখে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন এবং আমাদের কাছে পবিত্র কুরআন রয়েছে; আমাদের জন্য এই কিতাবই যথেষ্ট।' কিন্তু কোনো কোনো সাহাবী বললেন-'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা লিখে দিতে

চাচ্ছেন, তা লিখিয়ে নেওয়া হোক।' কেউ কেউ প্রতিবাদ করে উঠলেন- 'দরকার নেই, উমর যা বলছেন, সেটাই ঠিক।' মতভেদ কথা কাটাকাটিতে পরিণত হলে শোরগোল বেড়ে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হয়ে বললেন-'তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে উঠে যাও।'১১

সেদিনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি ব্যাপারে অসিয়ত করলেন-

এক. ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার কথা বললেন।

দুই. প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি যেমন ব্যবহার করতেন, তেমন ব্যবহার অকরার নির্দেশ দিলেন।

তৃতীয় কথাটি বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন; সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন-সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা অথবা উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে প্রেরণ করার কথা বলেছেন, অথবা তিনি বলেছিলেন-'নামায এবং তোমাদের অধীনদের প্রতি খেয়াল রাখবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুখের তীব্রতা সত্ত্বেও ইন্তেকালের চার দিন আগ পর্যন্ত সকল নামাযে নিজেই ইমামতি করেন। এ দিনের মাগরিবের নামাযেও তিনি ইমামতি করেন। নামাযে তিনি সূরা মুরসালাত তেলাওয়াত করেন।

এশার সময় অসুস্থতা এত বেড়ে যায় যে, মসজিদে যাওয়ার শক্তি পাচ্ছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন-'লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে?' সাহাবীরা বললেন-'জি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'আমার জন্য পাত্রে পানি আনো।' পাত্রে পানি আনা হলো। তিনি গোসল করলেন। এরপর উঠতে চাইলেন, কিন্তু অচেতন হয়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন-'লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে?' তাঁরা বললেন- 'জি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই অবস্থা হলো। তিনি গোসল করে উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

তারপর তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহকে খবর পাঠালেন, তিনি যেন নামায পড়িয়ে দেন। এরপর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতার অন্য দিনগুলোতেও আবু বকর সিদ্দীক নামায পড়াতে থাকলেন।১২

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু যেহেতু নিরীহ মানুষ আর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে কিছু লোক তাঁকে হিংসা করতে পারে, তাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিন-চারবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেন যে, ইমামতির দায়িত্ব আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ ব্যতীত অন্য কাউকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবারই আয়েশার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। শেষবার বলেন-
'তোমরা এমন কথা বলছো, যেমনটা
মিসরের নারীরা বলেছিলো ইউসুফ আলাইহিস সালামকে।'

শনি বা রোববার দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। তিনি দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের নামাযের জন্য মসজিদে যান। সে সময় আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহ সাহাবীদের নামায পড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তিনি পেছনে সরে আসতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা করলেন যে, পেছনে সরে আসার দরকার নেই। যাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এসেছিলেন, তাঁদের বললেন, আমাকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দাও। তাঁকে আবু বকরের ডান পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো। আবু বকর সিদ্দীক তখন নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একতেদা করলেন। ১৩

অসুস্থ অবস্থায়ই তাঁর কাছে আসওয়াদ আনাসীর মিথ্যা নবুওয়তের দাবির সংবাদ এসেছিলো। তাকে দমন করার জন্য তিনি একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। মৃত্যুর একদিন আগে অহীর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, মুসলিম বাহিনী আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেছে।

ইন্তেকালের একদিন আগে রোববার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সব দাস-দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বর্ম

একজন ইহুদির কাছে তিন সা যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিলো। তাঁর কাছে সে সময় সাত দিনার ছিলো, তিনি সেগুলোও সদকা করে দিলেন। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের হিবা করে দিলেন। রাতের বেলা চেরাগ জ্বালানোর জন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে তেল নিয়ে এলেন।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে সাহাবীদের, কারো মনে শান্তি নেই, সবাই অস্থির। খাওয়াদাওয়া, ঘুম-সবকিছু ওই একটা ঘরের সাথে সম্পৃক্ত। বাবা-মার গম্ভীর মুখ দেখে মদীনার ফুলশিশুরা পর্যন্ত দুষ্টুমি ভুলে গেছে। এক গভীর বিষণ্নতা ও আশঙ্কায় ছেয়ে আছে পুরো মদীনা। সবকিছু কেমন যেন থমকে আছে।

উসামা বিন যায়দের বাহিনীতে বড় বড় যে সব সাহাবী ছিলেন, রাসূলের অসুস্থতার সংবাদ শুনে সেনাপতির অনুমতি নিয়ে তাঁরাও ফিরে এসেছেন মদীনায়।

সেদিন ছিলো সোমবার, মুসলমানরা ফজরের নামায আদায় করছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামতির দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা সিদ্দীকার কামরার পর্দা সরালেন এবং সাহাবীদের কাতারবাঁধা অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখে তাঁর চোখ জুড়িয়ে মহানবী সা.

গেলো-এই তো তাঁর পৃথিবী। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তা সম্পূর্ণ হয়েছে। অপার্থিব সুখে তাঁর মুখে ফুটে উঠলো স্বর্গীয় হাসি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুটা পেছনে সরে গেলেন, যেন নামাযের কাতারে নবীজি শামিল হতে পারেন। হঠাৎ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে সাহাবীরা এত আনন্দিত হলেন যে, মনে হলো, তাঁরা নামায ছেড়ে দিয়ে নবীজির শারীরিক অবস্থার খবর নিতে ছুটে যাবেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে সাহাবীদের ইশারা করলেন, তাঁরা যেন নামায পূর্ণ করেন।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরার ভেতর চলে গিয়ে পর্দা ফেলে দিলেন।১৪ এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অন্য কোনো নামাযের সময় আসেনি!

রাসূলের অসুস্থতায় ফাতেমা খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রাণটা ছটফট করছিলো তাঁর। বাবা চলে গেলে তাঁর পৃথিবীটা শূন্য হয়ে যাবে। কে তাঁকে স্নেহ করবে। বাবার ঘরে বেড়াতে এলে কে তাঁকে দেখে খুশিতে আত্মহারা হবে! কে তাঁকে দেখে সহাস্যে অভিবাদন জানিয়ে হাত ধরে এনে নিজের আসনে বসাবে! তাঁর কাণ্ড দেখে মনে হতো, যেন কতদিন পর তিনি কন্যাকে দেখছেন!

ফাতেমা মাকে হারিয়েছেন শৈশবে, কিন্তু বাবা কখনো তাঁকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। সর্বদা ফাতেমার সংসারের খোঁজ রেখেছেন। সাধ্যানুযায়ী সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দিয়েছেন। সবদিকেই তাঁর ছিলো তীক্ষ্ণ নজর। জামাই কন্যার সাথে রাগ করলে নিজের স্নেহ দিয়ে সেটা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

একদিন ফাতেমার ঘরে গিয়ে দেখেন, আলী ঘরে নেই। ফাতেমার কাছে জানতে পারেন, আলী ফাতেমার সাথে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। তিনি খোঁজ নিয়ে মসজিদে গিয়ে দেখেন, আলী মসজিদে শুয়ে আছেন। একপাশ থেকে পরিধেয় চাদর সরে গেছে। শরীরে মাটি লেগে আছে। কাছে গিয়ে তিনি পরম মমতায় মাটি মুছে দিতে দিতে বলেন-'হে মাটির বাবা, ওঠো ওঠো!'

অসুস্থ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে কাছে ডেকে এনে বসালেন। তারপর কানে কানে বললেন-'জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতি রমযানে আমার সাথে কুরআনে কারীম একবার দাওর করতেন, কিন্তু এ বছর দুবার করেছেন। আমার মনে হয়, এই অসুখেই আমার মৃত্যু হবে।'

ফাতেমা পিতার কথা শুনে কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ফাতেমার কানে কানে বললেন, 'আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার কাছে পরলোকে পৌঁছে যাবে।'

ফাতেমা কমবয়সী রমণী। তিনি এইমাত্র জানতে পারলেন অচিরেই তাঁর মৃত্যু হবে। সুতরাং স্বামী-সন্তান ও পৃথিবীর মহব্বতে তাঁর দুঃখী হওয়ার কথা, অথচ পিতাকে তিনি এত বেশি ভালোবাসেন যে, পিতার সাথে তাড়াতাড়ি দেখা হওয়ার কথা শুনে আনন্দে হেসে ফেললেন ।১৫

ফাতেমার পিতা শুধু পিতা নন, সন্তানদের বন্ধুও ছিলেন। শিক্ষক ছিলেন তিনি। সন্তানের সুখে সুখী হতেন, দুঃখে দুঃখী হতেন। সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় তাঁদেরকে জীবন ও জগতের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। এ জগতের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতেন।

আটা পিষতে পিষতে ফাতেমার হাতের চামড়া ক্ষয়ে গিয়েছিলো। ফাতেমা একজন খাদেমা চাইলে তিনি বললেন- 'মাগো, আমি কি একজন খাদেমার চেয়েও উত্তম কিছুর কথা বলবো?' ফাতেমাকে তিনি রাতে শুতে যাওয়ার আগে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলার আমলটা শিক্ষা দিলেন। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মূল্যহীনতা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। শুধু ফাতেমা নয়, অন্য সন্তানদের প্রতিও তাঁর পরম যত্নের দৃষ্টি ছিলো।

মা-হারা কন্যাদের সঠিক সময়ে সুযোগ্য পাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছেন। রুকাইয়া মারা যাওয়ার পর উসমানের কাছে উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু উম্মে কুলসুমও বাঁচেননি। ফাতেমা ছাড়া তাঁর সব সন্তানই চলে গেছেন পরপারে। গভীর মমতা ছিলো তাঁর সন্তানদের জন্য! উম্মে কুলসুমের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর কবরের কাছে বসে শিশুর মতো কেঁদেছেন!

হিজরতের শেষ সময়ে মারিয়া কিবতিয়ার কোল আলো করে জন্ম নিয়েছেন ইবরাহীম। কিন্তু তিনিও ষোলো বা সতেরো মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন। মৃত ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিয়ে পরম মমতায় তাঁকে চুমু দেন। নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ শোঁকেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিলো। কিন্তু আজ তাঁর সকল কষ্টের, সকল দুঃখের শেষ দিন। অসুস্থ পিতার কষ্ট দেখে ফাতেমা বলেন- 'উহ, আমার পিতার কী কষ্ট!' এ কথা

শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'তোমার পিতার আজকের পর আর কোনো কষ্ট নেই, মা।'১৬

চিরদুঃখী তিনি। বাবা-মা-দাদাকে হারিয়েছেন শৈশবে। প্রিয় চাচা ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছেন একই সাথে জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে। তারপর একে একে হারিয়েছেন ছয়টি সন্তান। বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হয়ে হারিয়েছেন প্রিয় সঙ্গী-সাথী। কত ব্যথা, কত দুঃখ ছিলো তাঁর জীবনের প্রতিটি বাঁক জুড়ে। তারপরও ধৈর্য হারাননি। মুখ গোমড়া করে রাখেননি। সকল দুঃখ মনের গভীরে চাপা দিয়ে স্মিতহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করে সংসার-সমাজ-রাষ্ট্র সামলেছেন একসাথে।

ও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়াসরিবকে পরিণত করেছেন সোনার মদীনায়। সমাজে কোনো অশান্তি, অনিয়ম নেই। সংসারও তাঁর সোনার সংসার। সমাজে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু সুখের অভাব নেই। সংসারে ক্ষুধা আছে, কিন্তু শান্তির অভাব নেই। যেভাবে তাঁর কন্যা তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, সেভাবে তাঁর স্ত্রীরাও তাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। অসুস্থতার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন কষ্ট হচ্ছিলো, তখন সাফিয়্যা তাঁর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বলেন-'হে আল্লাহর নবী, আপনার এই সব কষ্ট আমি সহ্য করতে পারলে খুশি হতাম।'

সাফিয়্যা অতীতে ইহুদি ছিলেন। নবীজির সাথে তাঁর বিয়েরও বেশি দিন হয়নি। তাই তাঁর কথা অনেকে বিশ্বাস করলো না। তাঁর দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'আল্লাহর কসম, সে সত্য বলেছে। '১৭

এই ভালোবাসায় সত্যিই এতটুকুও খাদ ছিলো না। সাফিয়্যার মন-প্রাণ পূর্ণ করে রেখেছেন তিনি। আয়েশা ও হাফসা যখন তাঁকে কাঁদিয়েছেন, তখন নবীজি স্নেহভরে তাঁর চোখের অশ্রু মুছে দিয়েছেন। মমতামাখা কণ্ঠে তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছেন আয়েশা ও হাফসার কথার উত্তর।

একদিন সাফিয়্যা তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। পথে তিনি সামান্য পিছিয়ে পড়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা দেখে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সাফিয়্যা কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে সাফিয়্যা বললেন-'আপনি আমাকে একটা ধীরগামী গাধায় সওয়ার করিয়ে দিয়েছেন!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহভরে সাফিয়্যার চোখের অশ্রু মুছে দিয়ে বললেন-'আর কেঁদো না।'

এমন স্নেহ, ভালোবাসা ও প্রেমে তিনি বিভোর করে রেখেছিলেন তাঁর প্রত্যেক প্রিয়তমাকে। একাধারে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপ্রধান এবং উম্মাহর শিক্ষক। কিন্তু এত এত ব্যস্ততার পরও স্ত্রীদের গল্প শোনাতেন, স্ত্রীদের কাছ থেকে গল্প শুনতেন। সফরে না থাকলে প্রায় প্রতিদিনই স্ত্রীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়েছেন। সবার শেষে গিয়েছেন যাঁর কাছে থাকার পালা, তাঁর ঘরে। আবার শুধু গল্প ও স্নেহ নয়, গৃহস্থালি কাজেও স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। স্ত্রীদের পড়াশোনার প্রতিও লক্ষ রাখতেন। হাফসা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী।

আয়েশার মতো শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁর ছিলো বড় আগ্রহ। তাঁর জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ লক্ষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় তাঁকে বিভিন্ন বিষয় শেখানোর চিন্তা করতেন। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। তিনি পড়ালেখা জানতেন। হাফসাকে তিনি লেখা শেখান। তিনি রোগ নিরাময়ের কিছু পথ্যও জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তাঁর এ বিদ্যা হাফসাকে শেখানোর জন্য। ১৮

আয়েশাকে বিভিন্ন বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁকে দিয়েছেন অতুলনীয় স্নেহ-ভালোবাসা। শত ব্যস্ততার পরও আয়েশার শৈশব-কৈশোর এই মহান মানুষটা পরম মমতায় আগলে রেখেছেন।

সারাদিন ব্যস্ত থাকার পরও রাতের বেলা চারদিক নীরব হয়ে এলে আয়েশাকে সাথে নিয়ে হাঁটতে বের হয়েছেন। কখনো দুজন একসাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। আয়েশার জীবনে তাঁর সঙ্গই ছিলো জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া, বড় সুখ।

একবার এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মজা করার জন্য আয়েশার সাথে হাফসা সওয়ারি পরিবর্তন করেন। কিন্তু বদল করার পর আয়েশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরহ সহ্য করতে পারেননি। তিনি পা দুখানি ইযখির ঘাসের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বললেন- 'হায়, কোনো সাপ বা বিচ্ছু যদি আমাকে দংশন করতো!'১৯

আজ আয়েশাকে ছেড়ে তিনি চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছেন। আয়েশা তাঁর বিরহ সহ্য করবেন কী করে! কী করে তাঁর বিরহ সহ্য করবেন তাঁর প্রিয়তমারা, তাঁর সাহাবীরা! তিনি তো সেই মানুষ, যিনি সকলের প্রিয়তম। সবাই তাঁকে নিজের পরিবার-পরিজন, এমনকি নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

মানুষ তো মানুষ, এমনকি ফেরেশতাদের সর্দার জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। জীবনে তিনি কত সহস্র নবীর কাছে গিয়েছেন। কারো কাছে একবার, কারো কাছে দুবার, কারো কাছে শতবার। দেখেছেন তাঁদেরকে দূর থেকে, কাছ থেকে। কিন্তু কাউকে নবীজির মতো ভালোবাসেননি।

একবার আল্লাহর রাসূল তাঁকে কুরআনের আয়াত 'আমি আপনাকে জগদ্বাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি'-এর পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর মাধ্যমে জিবরীল কোনো রহমতপ্রাপ্ত হয়েছেন কি না, যেহেতু ফেরেশতাদের ভুবনও জগৎসমূহের অন্তর্ভুক্ত?

জিবরীল বলেন-'হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর শপথ, আপনাকে আমি সকল নবীর চেয়ে বেশি ভালোবাসি। আমি এমন কারো কাছে যাইনি, যাঁকে আপনার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। আল্লাহ যেদিন সূরা তাকবীরের ২০ নম্বর আয়াত নাযিল করেন, সেদিন আমি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়েছি আপনার মাধ্যমে।'

জিবরীল ভাবতেন, এই সবকিছুর শেষে তাঁর কী হবে? কিন্তু যেদিন এ আয়াত নাযিল হয়, সেদিন তিনি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত হন আর সেদিন আল্লাহর রাসূলের রহমত

অনুভব করেন। ২০ সেদিন মানুষের সরদারের মাধ্যমে ফেরেশতাদের সর্দার নিরাপত্তা লাভ করেন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের প্রধান আর জিবরীল সকল ফেরেশতার প্রধান। কী যে অসাধারণ সম্পর্ক ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সৃষ্টির প্রধানদের মধ্যে! রাসূলের কাছে জিবরীল এসেছেন হাজার হাজার বার।

সেই শৈশব থেকে দেখছেন তাঁকে। তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, বাস্তবে দেখা দিয়েছেন। তাঁর অস্থিরতায় সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন। প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর বলেছেন- 'হে মুহাম্মাদ, আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী।' তাঁর দুঃখে অংশ নিয়েছেন। তাঁর সাথে প্রতিটি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। মাটিতে বসে রাসূলের হাঁটুতে হাঁটু মিলিয়ে তাঁর সাহাবীদের দীন শিখিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 'উম্মাহ উম্মাহ' বলে অস্থির হয়ে পায়চারি করেছেন, জিবরীল তখন উপস্থিত হয়ে শুনিয়েছেন- 'শুধু ঈমান আনলেই আপনার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে!'

আর জান্নাতুল বাকী থেকে ফেরার পর যখন তাঁর জ্বর উঠলো, তখনো জিবরীল ছুটে এসেছেন। বলেছেন-'হে মুহাম্মাদ, আপনি কি অসুস্থ?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'হ্যাঁ।' জিবরীল তখন রাসূলের মুখে-বুকে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন আর তাঁর জন্য দুআ করেছেন। এরপর তাঁর কাছে তিনি দুটি জীবনের একটি গ্রহণ করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার-পরিজনের চেয়ে পরম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রস্তাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পৃথিবীতে অবস্থানের শেষ সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার পরিবার-পরিজনকে ডেকে নসিহত করেন।

সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যেও নসিহত করেন। তাঁদের তিনি বারবার বলেন একটি কথা- 'নামায, নামায এবং তোমাদের অধীন দাস-দাসী।' ২১

শেষ মুহূর্তে তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার গায়ের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় বসে ছিলেন। এ সময় আয়েশার ভাই আবদুর রহমান বিন আবু বকর ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি মিসওয়াক। আয়েশা লক্ষ করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আয়েশা বুঝলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াক চান। জীবনে তো কখনো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে মিসওয়াক করা ব্যতীত দাঁড়াননি। আর এখন তো তিনি সরাসরি তাঁর কাছে যাচ্ছেন।

আয়েশা বললেন-'আপনার জন্য মিসওয়াক আনবো কি?' তিনি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন। আয়েশা মিসওয়াক আনলেন, কিন্তু সেটা শক্ত ছিলো। বললেন-'আপনার জন্য নরম করে দেবো?' তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আয়েশা দাঁত দিয়ে নরম করে দিলেন। এরপর তিনি ভালোভাবে মিসওয়াক করলেন। কাছে একটি পাত্রে পানি ছিলো। তিনি হাত ভিজিয়ে চেহারা মুছলেন এবং বললেন-'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। মৃত্যু বড় কঠিন।' ২২

মিসওয়াক শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত অথবা আঙুল তোলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিলো ছাদের দিকে। মুখ ছিলো হাস্যোজ্জ্বল। উভয় ঠোঁট নড়ছিলো। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন! আয়েশা মুখের কাছে কান পাতলেন। তিনি শুনলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন-'হে আল্লাহ! নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তি, যাঁদের আপনি পুরস্কৃত করেছেন, আমাকে তাঁদের দলভুক্ত করুন, আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমার উপর রহমত নাযিল করুন, আমাকে সুমহান বন্ধুর সঙ্গে মিলিত করুন। হে আল্লাহ! সুমহান বন্ধু!' ২৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। এর পরপরই তাঁর হাত ঝুঁকে পড়লো আর তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতি জগতে তাঁর সুমহান বন্ধুর কাছে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সেদিন ছিলো একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার। তখন তাঁর

বয়স হয়েছিলো তেষট্টি বছর।

হৃদয়বিদারক এই শোক সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে শোকের কালো মেঘ গোটা দিগন্ত অন্ধকার করে দেয়। মানুষ শোকে অসংযত হয়ে পড়ে। সবখানে ছড়িয়ে পড়ে অস্থিরতা। এ যেন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য এক সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মদীনায় আগমন করেছিলেন, সেদিনের চেয়ে সমুজ্জ্বল দিন আর ছিলো না, আর যেদিন তিনি সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন, তারচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন কেউ কখনো দেখেনি! ২৪

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা শোকে কাতর হয়ে বললেন- 'হায়, আমার প্রিয় পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন হায়, আমার প্রিয় পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায়, প্রিয় পিতা! জিবরীল আলাইহিস সালামকে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ জানাচ্ছি।' ২৫

সাহাবীরা বেকারার হয়ে পড়লেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুঃখে-শোকে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। 'উমর শান্ত হও'-বলার জন্য নবীজি তখন আর নেই! তিনি তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে বললেন- 'কিছু মুনাফিক মনে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আসলে তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে ঠিক সেভাবে গেছেন, যেভাবে মুসা ইবনে ইমরান গিয়েছিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের কাছ থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন, অথচ তাঁর ফিরে আসার আগে তাঁর স্বজাতির লোকেরা বলাবলি করেছিলো, মুসা আলাইহিস সালাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর শপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ফিরে আসবেন। তাই যারা বলবে, তিনি মারা গেছেন, আমি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবো!' ২৬

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় ছিলেন না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর খবর শুনে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটে এলেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। এরপর কাউকে কোনো কথা না বলে সোজা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে গেলেন। দেখলেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধুর দেহ মোবারক

ডোরাকাটা ইয়ামানি চাদরে ঢাকা। আবু বকর তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে চাদর সরালেন। সেই চিরপরিচিত নিষ্পাপ সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখ, কিন্তু নীরব-নিস্তব্ধ।

আবু বকর কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর পবিত্র কপালে চুম্বন করলেন। এরপর বললেন- 'আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান হোক, আল্লাহ তাআলা আপনাকে দুবার মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য লেখা ছিলো, তা আপনি বরণ করে নিয়েছেন!'

এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইরে বেরিয়ে এলেন। উমর তখনো অস্থিরভাবে সমবেত লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন- 'উমর, বসে পড়ো।' উমর বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। সাহাবীরা উমরকে ছেড়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি মনোযোগী হলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হামদ ও সালাতের পর বললেন-'তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত করতো, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ইবাদত করতো, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-মুহাম্মাদ একজন রাসূলমাত্র, তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? যদি কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, সে আল্লাহর ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই করবে না।

আর যারা কৃতজ্ঞ, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করবেন।'

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৪)

দিশেহারা ও অস্থির সাহাবীরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য শুনে বিশ্বাস করলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতই ইন্তেকাল করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলার আগে তাঁরা যেন জানতেনই না, আল্লাহ তাআলা পবিত্র

কুরআনের এই আয়াত নাযিল করে রেখেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তেলাওয়াতের পর সাহাবীরা এই আয়াত মুখস্থ করলেন।

মনের জখমে প্রলেপ লাগানোর জন্য সবার মুখে মুখে এই আয়াত উচ্চারিত হতে লাগলো। উমর যখন বুঝতে পারলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যি সত্যি ইন্তেকাল করেছেন; তিনি মাটিতে বসে পড়লেন! ২৭

শোকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মদীনা। প্রত্যেকটা হৃদয়ে যেন সর্বনাশা এক তুফান বইতে শুরু করলো। কিন্তু সময় তো বয়ে যায়, তুফানও একসময় শান্ত হয়, আর প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতেই হয়। মুসলমানদের দিশেহারা অবস্থা, বেদনায় অস্থির পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

খলিফা মনোনীত করা সেই মুহূর্তেই প্রয়োজন ছিলো। হঠাৎ করে খলিফা মনোনয়নের প্রশ্নে আনসার সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে সামান্য মতবিরোধ দেখা দিলেও অবশেষে সকলে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত হওয়ার ব্যাপারে একমত হন।

খলিফা মনোনয়ন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন-দাফনের ব্যবস্থায় সোমবারের বাকি সময় কেটে গেলো। পরদিন মঙ্গলবার ঘরের লোকেরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ অনাবৃত না করেই তাঁকে গোসল দিতে শুরু করলেন। আব্বাস, আব্বাসের দুই পুত্র ফযল ও কুসাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ বদলে দিচ্ছিলেন। উসামা ও নবীজির আজাদকৃত দাস শুকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল দিচ্ছিলেন। আউস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের বুকের সাথে ধরে রেখেছিলেন।

গোসল দেওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি সাদা ইয়ামানি চাদর দিয়ে জড়িয়ে কাফন পরানো হয়। এতে জামা কিংবা পাগড়ি ছিলো না। ২৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোথায় দাফন করা হবে, সাহাবায়ে কেরাম সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত দিলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সকল নবীকে তাঁদের মৃত্যুর স্থানে দাফন করা হয়েছে।' এরপর আল্লাহর রাসূলের বিছানা সরিয়ে সেখানে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কবর খনন করেন।

এরপর দশজন দশজন করে সাহাবী হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে জানাযার নামায আদায় করেন। এ নামাযে কেউ ইমাম হননি। সর্বপ্রথম বনু হাশিম গোত্রের লোকেরা নামায আদায় করেন। এরপর মুহাজিররা, এরপর আনসাররা, এরপর অন্যান্য পুরুষ, এরপর মহিলারা এবং সবশেষে শিশুরা জানাযার নামায আদায় করেন।

জানাযার নামায আদায়ে মঙ্গলবার পুরো দিন অতিবাহিত হয়। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে প্রিয় নবী রহমাতুল লিল আলামীন মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ মাটির উপরের জগৎ থেকে কবরের ভেতর রাখা হয়। তাঁকে সমাহিত করার পর ফাতেমা বলেন-'হে আনাস, আব্বাজানকে মাটিচাপা দিতে কী করে তোমাদের মন সায় দিলো?!' ২৯

তেষট্টি বছর আগে যে চন্দ্রশিশু বনু হাশিম গোত্রের এক বিধবা তরুণীর কোল আলো করে পৃথিবী নামের গ্রহে এসেছিলেন, তিনি তাঁর কোমল স্নিগ্ধ আলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে ওপারের বিশাল আশ্চর্য জগতে রব্বে কারীমের দরবারে পাড়ি জমান।

সমাপ্তি ঘটে জগতের সবচেয়ে চমৎকার জীবনটির। সমাপ্তি ঘটে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের। পৃথিবীতে মানুষের জীবনের শেষ আছে, শেষ আছে নবীদের জীবনেরও, কিন্তু সময়ের শেষ কোথাও নেই। সময় থেমে থাকে না।

গাছের পাতা ঝরে একটা একটা করে। খর্জুরবীথিতে আসে নতুন খেজুর।

শীত-বসন্তের দিন আসে-যায়। হয়তো হাবশি বালকেরাও আগের মতো খেলায় মেতে ওঠে, শুধু কোনো মহামানব প্রিয়তমাকে সাথে নিয়ে তাদের খেলা দেখেন না। হাসান-হুসাইনের ঘোড়া হারিয়ে গেলেও তাঁরা ঠিকই বড় হতে থাকেন।

বেলালের চমৎকার সুরের আযান আর শোনা যায় না হয়তো, কিন্তু আযানের মধুর সুর ঠিকই মদীনার বাতাসে ধ্বনি তোলে।

তরুণ সেনাপতি উসামা বিন যায়দের অভিযানও থেমে থাকে না। ইসলামের প্রথম খলিফা আমিরুল মুমিনীন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে নির্দেশ আসে প্রবল প্রতাপশালী রোমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার। শুরু হয় নতুন এক অধ্যায়...।

উপসংহার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী মানবজাতির জন্য এক অনন্য আদর্শ। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমাশীল। মানুষের শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবন থেকে আমরা সততা, ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা পাই। তাই রাসূল ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।